হিজিবিজি

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

—'ক্যাম্পে', জীবনানন্দ দাশ

প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে 'নন্দিত নরকে'র মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত এক পরিবারের যাপিত জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন, মর্মান্তিক ট্রাজেডি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নগরজীবনের পটভূমিতেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত। তবে গ্রামীণ জীবনের চিত্রও গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন এই কথাশিল্পী। এর উজ্জ্বল উদাহরণ 'অচিনপুর', 'ফেরা', 'মধ্যাহ্ন'। মুক্তিযুদ্ধ বারবার তাঁর লেখায় ফুঠে উঠেছে। এই কথার উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'জোছনা ও জননীর গল্প', '১৯৭১', 'আগুনের পরশমণি', 'শ্যামল ছায়া', 'নির্বাসন' প্রভৃতি উপন্যাস। 'গৌরীপুর জংশন', 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ', 'চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক'-এ জীবন ও চারপাশকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বাদশা নামদার' ও 'মাতাল হাওয়া'য় অতীত ও নিকট-অতীতের রাজরাজড়া ও সাধারণ মানুষের গল্প ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে।

গল্পকার হিসেবেও হুমায়ূন আহমেদ ভিন্ন দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। ভ্রমণকাহিনি, রূপকথা, শিশুতোষ, কল্পবিজ্ঞান, আত্মজৈবনিক, কলামসহ সাহিত্যের বহু শাখায় তাঁর বিচরণ ও সিদ্ধি।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ এবং মৃত্যু ১৯ জুলাই ২০১২।

আলোকচিত্র : মাজহারুল ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিজিবিজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিজিবিজি

হুমায়ূন আহমেদ

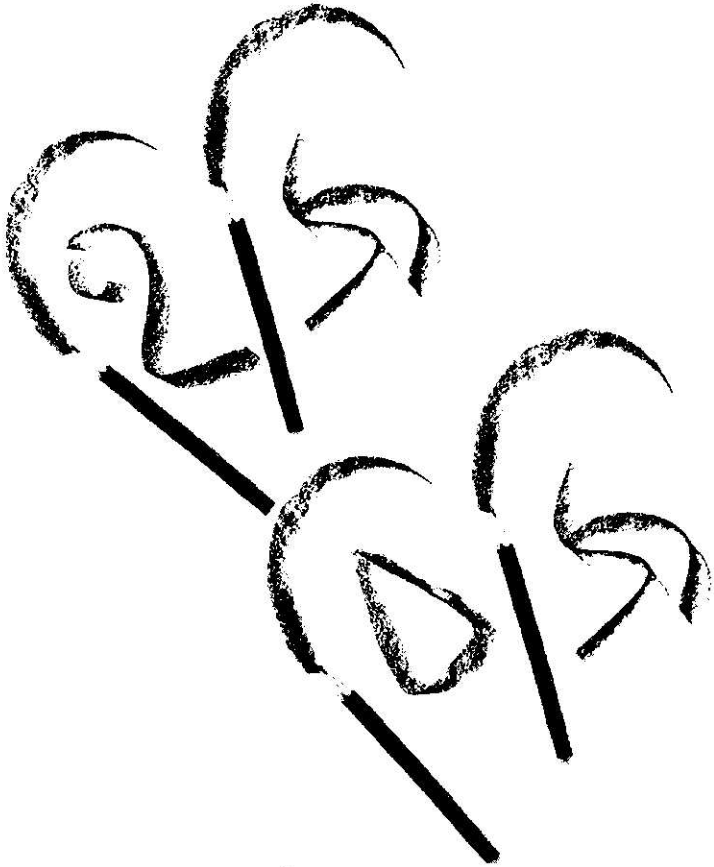

অন্যপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের নিবেদন

চার দশকের লেখকজীবনে হুমায়ূন আহমেদ সৃজন করেছেন বিচিত্র বিষয়ে অজস্র রচনা। কিংবদন্তি এই শব্দশিল্পী সাহিত্যের যে অঙ্গনে হাত রেখেছেন, তা প্রোজ্জ্বল হয়েছে তার আপন মহিমায়; পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য হয়েছে।

শৈশবে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন 'জোছনার ফুল'-এর অপার রহস্য আর সৌন্দর্যে। আমৃত্যু তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে সেই রহস্য আর সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করে গেছেন। মানবমনের রহস্যময়তাও তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তাই তিনি মনের গহীন অন্ধকার থেকেও টুকরো টুকরো ঝলমলে আলো তুলে এনেছেন নিপুণ কুশলতায়।

এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে নন্দিত এই কথাশিল্পীর এমন কিছু রচনা যাতে তাঁর বহুমাত্রিক শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আত্মজৈবনিক কিছু রচনা আছে যেখানে স্থান পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি আর নিজস্ব অনুভূতি। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ে তাঁর ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে অন্তত চারটি লেখায়। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে একাধিক রচনায়। টেলিভিশন নাটক আর রিয়েলিটি শো নিয়ে আছে দুটি রচনা। তাঁর ক্রিকেটপ্রেম, এবং তার মধ্যে দিয়ে তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যাবে দুটি লেখায়। অন্য কিছু লেখাতেও বাংলাদেশ আর বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ রচনা 'মাইন্ড গেম' গভীর জীবনবোধের কথা বলে।

বিচিত্র বিষয়ে লিখিত হলেও সবগুলো রচনাই অনন্য রসবোধ ও অসাধারণ রচনাশৈলীতে সমৃদ্ধ। আশ্চর্য সারল্য আর মনকাড়া উপস্থাপনার যে বৈশিষ্ট্য একান্তই হুমায়ূন আহমেদের, তার পরিচয় পাওয়া যাবে গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি লেখায়।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের প্রেক্ষাপট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। হুমায়ূন আহমেদের জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়। ধ্রুব এষ গ্রন্থটির জন্যে প্রচ্ছদও তৈরি করেছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ প্রচ্ছদ দেখে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, বইটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আগেই অন্তহীন এক ভ্রমণে রওনা হয়ে গেছেন তিনি, একাকী, নিঃসঙ্গ।

ছাপার আগে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ দেখতেন, মতামত জানাতেন। *হিজিবিজি* তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ যেটির প্রচ্ছদ তিনি দেখেছেন, অনুমোদন দিয়েছেন ছাপানোর। তাই গ্রন্থটির স্মারক-তাৎপর্যও কম নয়।

হুমায়ূন আহমেদ আমাদের মাঝে আছেন তাঁর অনন্য সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে। সেখানেই আমরা তাঁকে খুঁজে পাব। আশা করছি, তাঁর অন্য গ্রন্থগুলোর মতো *হিজিবিজি*-ও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পাবে; ভালোবাসা আর মমতায় পাঠকসঙ্গ পাবে আগের মতোই।

মাজহারুল ইসলাম
islam1966@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

মা	৯
কবি সাহেব	১২
লাউ মন্ত্র	২১
মাসাউকি খাতাঁওরা	২৭
হিজ মাস্টারস ভয়েস	৩২
বর্ষাযাপন	৩৮
অয়োময়	৪৩
বহুত দিন হোয়ে	৫৩
যদ্যপি আমার গুরু	৫৫
একজন আমেরিকানের চোখে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব	৬০
নিষিদ্ধ গাছ	৬৪
জ্বিনের বাদশাহ্	৬৭
রেলগাড়ি ঝমাঝম	৭৮
জ্বিন এবং পক্ষীকথা	৮১
ডায়েরি	৮৬
নামধাম	৯০
এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব ?	৯৫
অধ্যাপক ইউনূস	৯৮
যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ	১০০
তেত্রিশটা কামান নিয়ে বসে আছি	১০৪
মাঠরঙ্গ	১০৭
ঈদ ভয়ংকর!	১১১
ক্ষুদে গানরাজ	১১৩
একটি ভৌতিক গল্পের পোস্টমর্টেম	১১৬
এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি	১২২
মাইন্ড গেম	১২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা

আমেরিকানরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। তাদের রসিকতার বিষয় শাশুড়ি, মা না। আমাদের দেশে ব্যক্তি নিয়ে রসিকতা শালা-দুলাভাই, দাদা-নাতিতে সীমাবদ্ধ। মা-শাশুড়ি কিংবা বাবা-শ্বশুর কখনো না।

আমার মা রসিক মানুষ। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে রসিকতা করেন। কাজেই তাঁকে নিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েরও রসিকতা করার অধিকার আছে। মা'র রসিকতার নমুনা দেই।

একবার এক অপরিচিত মহিলা মা'কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে কয়টি?

মা বললেন, তিনটি।

বড় ছেলে কী করে?

মা বললেন, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার পিএইচডি ডিগ্রি আছে কেমিস্ট্রিতে।

ভদ্রমহিলা : মাশাল্লাহ। মেজোটি কী করে?

মা : সে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার একটা পিএইচডি ডিগ্রি আছে ফিজিক্সে।

ভদ্রমহিলা : মাশাল্লাহ। তিন নম্বর ছেলেটি কী করে?

মা : সে উন্মাদ।

ভদ্রমহিলা : আহারে, কী সর্বনাশ! সবচেয়ে ছোটটা উন্মাদ?

মা : সে 'উন্মাদ' না। সে *উন্মাদ* নামে একটা পত্রিকা বের করে।

ভদ্রমহিলা হতভম্ব। তাঁর সঙ্গে রসিকতা করায় খানিকটা রাগ। মা নির্বিকার।

আমি তখন 'অচিন রাগিনী' নামের তিন খণ্ডের একটা নাটক বানিয়েছি। মা আমার বাসায় বেড়াতে এসেছেন। নাটক আমার সঙ্গে দেখবেন। তিনি আগ্রহ নিয়ে নাটক দেখলেন। আমি বললাম, কেমন লাগল?

মা বললেন, তোর নাটক দেখতে দেখতে একটা কথা মনে হলো। তোর বাবা আগেভাগে মারা গিয়ে তোর জন্যে সুবিধা করে দিয়েছে।

আমি বললাম, কী রকম?

মা বললেন, সে ছিল নাটকপাগল। তোর নাটকে আসাদুজ্জামান নূর যে পার্টটা করেছে, এটা সে করার জন্যে তোকে বলত। তুই পার্ট তাকে দিতি না। এই নিয়ে পিতাপুত্রের মন কষাকষি। সমস্যা না? আগেভাগে মারা যাওয়ায় তুই বিরাট বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিস।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইবার মা'কে নিয়ে আমার রসিকতার গল্প। বাবার পোস্টিং তখন কুমিল্লায়। পুলিশের ডিএসপি। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ছুটিতে কুমিল্লায় গিয়ে দেখি মা মুরগি পুষছেন। তিনটা মুরগি। মুরগি ডিম পাড়বে। ওই ডিম খাওয়া হবে। প্রতিদিন সকালে মা খাঁচা খুলে আগ্রহ নিয়ে দেখেন মুরগি ডিম পাড়ল কি না। প্রতিদিন তাঁকে হতাশ হতে হয়। আমি গোপনে ডিম কিনে এনে রাতে খাঁচায় রেখে দিলাম। সকালে ঘুম ভাঙল মা'র আনন্দ-চিৎকারে। তিনটা মুরগি একসঙ্গে ডিম দিয়েছে। এরপর থেকে প্রতিদিনই খাঁচায় তিনটা করে ডিম পাওয়া যেতে লাগল। সবাই খুশি। একদিন মা'র আনন্দধ্বনি শোনা গেল না। অথচ আমি রাতে তিনটা ডিমই রেখেছি। তিনি ডিম হাতে আমার কাছে এসে বললেন, এইসব কী! মা'র সঙ্গে ফাজলামি ?

আমি বললাম, কী করেছি ?

মা বললেন, এই তিনটা তো হাঁসের ডিম। মুরগি তো হাঁসের ডিম পাড়বে না।

আমি বললাম, মা, ভুল হয়েছে। এরকম আর করব না।

মা এই ঘটনায় খুবই আহত হলেন। বাবার কাছে নালিশ করলেন। বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে যমের মতো ভয় পাই। ভয়ে অস্থির হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। বাবা বললেন, মুরগির ডিমের বদলে তুই হাঁসের ডিম কিনলি কী মনে করে ?

আমি বললাম, মুরগির ডিমই চেয়েছি। ডিমওয়ালা হাঁসের ডিম দিয়েছে।

বাবা বললেন, সবচেয়ে ভালো হতো পচা ডিম রাখলে। তোর মা ডিম ভাঙত, বিকট গন্ধে বাড়ি ভরে যেত। তিনটা মুরগি একসঙ্গে পচা ডিম কেন পাড়ল—এই নিয়ে আমরা তখন গবেষণায় বসতাম।

পাঠক, আমার বাবার রসবোধ কি ধরতে পারছেন ?

মানুষ যেমন রসিকতা করে প্রকৃতিও কিন্তু করে। সেই রকম একটা গল্প বলি। মা'র প্রতি প্রকৃতির রসিকতা।

মা তখন খুবই অসুস্থ। কিডনি প্রায় অকেজো। বিছানায় বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। একদিন হঠাৎ অচেতন হয়ে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্স এনে তাঁকে ল্যাব এইড হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তাঁকে CCU-তে রাখা হলো। ডাক্তার বরেন চক্রবর্তীর রোগী। তাঁর জ্ঞান ফিরল রাত তিনটায়। তিনি দেখলেন, সবুজ পর্দা ঘেরা একটা ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। আরামদায়ক আবহাওয়া। তাঁর সামনে সবুজ পোশাক পরা দু'টি রূপবতী (এবং বেঁটে) তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। [এরা নার্স। মা'র খোঁজ নিতে এসেছিল।]

মা'র ধারণা হলো তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর বেহেশত নসিব হয়েছে। কারণ বেহেশত সবুজ, এই খবর তিনি জানেন। মেয়ে দু'টি যে হুর এটাও বুঝা যাচ্ছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তিনি হুরদের জিজ্ঞেস করলেন, মা, এটা কি বেহেশত ?

হুর দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে রোগীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বলল, জি খালাম্মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন, তোমরা আমাকে বেহেশতের আঙ্গুর এনে দাও তো। খেয়ে দেখি কী অবস্থা।

হুর দু'জন আঙ্গুর নিয়ে এলে কী হতো আমি জানি না। তার আগেই ডিউটি ডাক্তার ঢুকলেন এবং বললেন, খালাম্মার জ্ঞান ফিরেছে। আপনার ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে আছে। ডেকে দেই কথা বলেন।

এই ঘটনার পর একদিন মা'কে বললাম, আপনার কি খুব বেহেশতে যাওয়ার ইচ্ছা ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, আপনি তো লোভী মহিলা না। বেহেশতের লোভ কেন করছেন ?

মা বললেন, বেহেশতে না গেলে তোর বাবার সঙ্গে তো দেখা হবে না। তোর বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই বেহেশতে যেতে চাই।

আমি বললাম, প্রথম দেখাতে তাঁকে কী বলবেন ?

বলব, ছয়টা ছেলেমেয়ে আমার ঘাড়ে ফেলে তুমি চলে গিয়েছিলে। আমি দায়িত্ব পালন করেছি। এদের পড়াশোনা করিয়েছি। বিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে। বেহেশতের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি আমাকে দেখাবে। শুধু আমরা দু'জন ঘুরব। তুমি তোমার সঙ্গের হুরগুলিকে বিদায় করো।

মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার। যখন মা'কে দেখি সেই ভয়াবহ ব্যাপারটির জন্যে তিনি আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন অবাক লাগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি সাহেব

ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই যদি শুনি—কেউ একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, চুপচাপ বসার ঘরে বসে আছে, তখন সঙ্গত কারণেই মেজাজ খারাপ হয়। ভোরবেলাটা মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যে আদর্শ সময় না। ভোরবেলার নিজস্ব চরিত্র আছে, আছে কিছু আলাদা নীতিমালা। ভোরবেলার নীতিমালা হলো, ঘুম থেকে উঠে নিজের মতো থাকবে, কোনোরকম টেনশন রাখবে না। হাত-পা ছড়িয়ে চা খাবে। খবরের কাগজ পড়বে। মেজাজ ভালো থাকলে গান শোনা যেতে পারে। মেজাজ খারাপ থাকলে গান শোনারও দরকার নেই। ভোরবেলায় যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তা হচ্ছে—অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলা। এই সময়ে কথা বলতে হবে শুধু পরিচিত এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে।

আমার কপাল মন্দ। যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁরা ভোরবেলায় আসেন। যাঁরা আসেন তাঁরা সহজে যেতে চান না। ইশারা-ইঙ্গিতে অনেকভাবে তাঁদের বুঝানোর চেষ্টা করি—দয়া করে এখন উঠুন। আমার ইশারা-ইঙ্গিত হয় তাঁরা বুঝেন না, নয় বুঝেও না বোঝার ভান করেন।

আজ যিনি এসেছেন তাঁকেও আমি বিদেয়-হতে-না-চাওয়া লোকদের দলে ফেললাম এবং মোটামুটি হতাশ হয়েই তাঁর সামনে বসলাম। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উপর। হালকা পাতলা গড়নের ছোটখাটো মানুষ। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে মাথার চুলও সাদা। কোলের উপর কালো চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে, কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকতেই তিনি অভ্যস্ত। আমি বললাম, আপনি কি কোনো কাজে এসেছেন ?

তিনি মৃদু গলায় বললেন, না।

আমি আঁতকে উঠলাম। যাঁরা সরাসরি বলেন, কোনো কাজে আসেন নি, তাঁরা সাধারণত অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে থাকেন। দুপুরের আগে তাঁদের বিদেয় করা যায় না।

আমি বললাম, কী জন্যে এসেছেন আমি কি জানতে পারি ?

জি পারেন।

দয়া করে বলুন।

আমি মফস্বলে থাকি। শহরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কম। বড় শহর আমার ভালো লাগে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভদ্রলোকের কথার ধরন ঠিক বুঝতে পারছি না। শহর প্রসঙ্গে তাঁর বিতৃষ্ণা আমাকে শোনানোর কারণও আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট হলো না। আমি মনের বিরক্তি চেপে সিগারেট ধরালাম।

শহর পছন্দ করি না, তবু নানা কাজকর্মে শহরে আসতে হয়।

তা হয়। পছন্দ না করলেও এই জীবনে আমরা অনেক কিছু সহ্য করি। আপনি কি চা খাবেন?

জি-না। আমার সামান্য কিছু কথা আছে। কথাগুলো বলে আমি চলে যাব।

আমি আশান্বিত হয়ে বললাম, বলুন। কথা বলে যদি উনি চলে যান তাহলে কথাগুলো শুনে নেওয়াই ভালো। সামান্য কথা বলছেন, তা-ও আশার ব্যাপার, হয়ত, ঘণ্টাখানিকের মধ্যে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

আমার বড়কন্যা-বিষয়ে একটি গল্প শোনাব।

শোনান।

আমি অনেক রাত জেগে পড়াশোনা এবং লেখালেখি করি—একরাতে লেখালেখি করছি—হঠাৎ শুনি আমার কন্যা খিলখিল করে হাসছে। কিছুক্ষণ থামে, আবার হাসে। আমার থামে, আবার হাসে। আমি বিরক্ত হলাম। তাকে বললাম, হাসছ কেন মা? সে বলল, গল্পের বই পড়ে হাসছি বাবা। আমি বললাম, হাসির গল্প? সে বলল, না দুঃখের গল্প। কিন্তু মাঝে মাঝে হাসির কথা লেখা। আমি বললাম, নিয়ে আস। আমার মেয়ে নিয়ে এল। আমি সেই বই পড়লাম। আপনার লেখা বই। আমি আগে কখনো আপনার নাম শুনি নি। এই প্রথম শুনলাম।

এইটা কি আপনার গল্প?

জি।

আপনার গল্প শুনে খুশি হয়েছি। আপনি যে আমার একটি বই পড়েছেন সেটা জেনেও ভালো লাগল।

আমার কথা একটু বাকি আছে।

জি বলুন।

ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, আমি নিজে একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছি। সেই গ্রন্থটি নিয়ে এসেছি।

এতক্ষণ ভদ্রলোকের আগমনের কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হলো। তিনি একজন গ্রন্থকার। গ্রন্থ প্রকাশে আমার সাহায্যের জন্যে এসেছেন। আমার মন খারাপ হলো এই ভেবে যে আমি ভদ্রলোককে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারব না। তাঁর লেখা যত ভালোই হোক প্রকাশকরা ছাপবেন না। পরিচিতিহীন মফস্বলের লেখকদের প্রতি ঢাকার প্রকাশকদের কোনোই আগ্রহ নেই। আমি বললাম, আপনি কি বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমার সাহায্য চান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

জি-না। বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বইটি আমার হাতে দিলেন। আমি বইয়ের পাতা উল্টে চমকে উঠলাম। দুটি কারণে চমকালাম—প্রথম কারণ, বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে আমার নামে। উৎসর্গপত্রে এমন কথা লেখা হয়েছে—আমি যার যোগ্য নই। দ্বিতীয় কারণ হলো, এই নিরহংকারী চুপচাপ ধরনের মানুষটি একজন বিখ্যাত মানুষ। এতক্ষণ আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। ইনি দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা। গবেষক, কবি ও প্রাবন্ধিক। বাংলা একাডেমী তাঁর একটি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। লিপির উপর লেখা তাঁর গ্রন্থ 'ব্রাহ্মী অথবা ব্রাহ্মী লিপি ও সম্রাট প্রিয়দর্শী' পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

লিপিতত্ত্বে এদেশে এবং ভারতে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ এ সময়ে জানেন বলে আমার জানা নেই।

আমি একই সঙ্গে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং লজ্জিত হলাম। এই সরল সাদাসিধা মানুষটিকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—এ কী কাণ্ড! এতবড় ভুল মানুষ করে? গোলাম মোর্তাজা সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং হাসিমুখে বললেন, আপনি কি একবার আমাদের হবিগঞ্জে যাবেন? আমার বাড়িতে একরাত থাকবেন?

আমি বললাম, অবশ্যই থাকব।

কথা দিচ্ছেন?

হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

আমার মেয়েরা খুব খুশি হবে। এরা যে আপনাকে কত পছন্দ করে আপনি তা কখনো জানবেন না। আমি আমার মেয়েদের জন্যে কিছু করতে পারি নি। আপনাকে নিয়ে গেলে ওদের জন্যে কিছু করা হবে।

আপনি যখন আমাকে যেতে বলবেন, আমি তখনি যাব।

আমি আপনাকে জানাব।

তিনি আমাকে কিছু জানাতে পারলেন না। হবিগঞ্জ ফিরেই অসুখে পড়লেন—প্রাণঘাতী ব্যাধি-ক্যানসার। চিকিৎসার জন্যে গেলেন জার্মানি। পত্রিকা মারফত তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেলাম। মনটা খারাপ হলো। কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখা গেল না।

তার প্রায় বছরখানিক পরের কথা—দেওয়ান গোলাম মোতার্জার পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো—দেওয়ান গোলাম মোর্তাজার নামে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে মোর্তাজা সাহেবের স্ত্রী আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন মোর্তাজা সাহেবের মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কথা রাখার সুযোগ পাওয়া গেল। আমি তিন কন্যা নিয়ে হবিগঞ্জে উপস্থিত হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবিগঞ্জে পৌঁছে মোর্তাজা সাহেবের পরিবারের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেলাম তার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। এরা আমার মতো অভাজনের জন্যে ভালোবাসার সোনার আসন বানিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি একেবারেই হকচকিয়ে গেলাম।

মোর্তাজা সাহেব সেখানে 'কবি সাহেব' নামে পরিচিত। তাঁর বাড়ি হলো–কবি সাহেবের বাড়ি। তাঁর মেয়েদের পরিচয় হলো—কবি সাহেবের মেয়ে।

কবি-পত্নীর নাম আম্বিয়া খাতুন। অসম্ভব রূপবতী, কঠিন ধরনের মহিলা। থাকেন কানাডায়। স্বামীর মৃত্যুদিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশে এসেছেন। স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। লেখক-স্বামীকে পারিবারিক সব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে গিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে এখন ক্লান্ত এবং স্বামীর প্রতি কিছুটা হয়তো অভিমানী।

কবি-পত্নী তাঁর সব কন্যাকে স্কুলের ছাত্রদের মতো লাইন করে দাঁড় করালেন। আমাকে দেখিয়ে কঠিন গলায় বললেন, ইনি তোমাদের বাবার বন্ধু। ইনি তোমাদের চাচা। চাচাকে পা ছুঁয়ে সালাম করো।

বড় বড় মেয়ে, সবাই বিবাহিতা। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও বড় বড়। মা'র কথা শোনামাত্র আমাকে হতচকিত করে এরা একসঙ্গে আমাকে সালাম করবার জন্যে ছুটে এল। একজনকে দেখলাম কাঁদছে।

আমি বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন ?

সে জবাব দিল না। তাঁর এক বোন বলল, ও তো আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে না। ও কানে শুনতে পায় না। বাচ্চা হওয়ার কী এক জটিলতায় ওর কান নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে কোনো প্রশ্ন করলে কাগজে লিখে করতে হবে।

আমার মনটাই খারাপ হলো। আমি এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখলাম—আপনি এত কাঁদছেন কেন ?

মেয়েটি তার উত্তরে বলল, চাচা, আপনি অবিকল আমার বাবার মতো। নিরহংকারী সাদাসিধা। আপনাকে দেখে বাবার কথা মনে পড়ছে—এইজন্যে আমি কাঁদছি।

আমি সারাজীবন শুনে এসেছি, আমি অহংকারী। এই প্রথম একটি মেয়ে আমাকে বলল, নিরহংকারী। আমার চোখ প্রায় ভিজে উঠার উপক্রম হলো।

কবি-কন্যা বলল, চাচা, আসুন, আমার বাবার লাইব্রেরিটা আপনাকে দেখাই। আমরা বাবার লাইব্রেরিতে যাই না। আজ আপনার সঙ্গে যাব। আর শুনুন, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

আচ্ছা তুমি করেই বলব, তোমরা বাবার লাইব্রেরিতে যাও না কেন ?

মা এক কাণ্ড করে রেখেছেন, এইজন্যে যেতে ইচ্ছা করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী কাণ্ড ?

যে কফিনে করে বাবার লাশ জার্মানি থেকে এসেছিল মা সেই কফিনটা লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন।

সে কী ?

হ্যাঁ, কী ভয়াবহ ব্যাপার দেখুন না। আপনি মা'কে একটু বলবেন কফিনটা যেন সরানো হয়। মা আপনার কথা ফেলতে পারবেন না।

কবি-পত্নী আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তোমার বাবার কফিন সরানো হবে না। এটা তোমার বাবার শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তোমাদের ভালো লাগুক—না লাগুক—কফিন থাকবে লাইব্রেরিতে।

লাইব্রেরি দেখলাম। বিস্মিত হওয়ার মতোই লাইব্রেরি। সবই মূলত লিপি বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ। দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। কবি-পত্নী জানালেন, দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডলিপির কিছু কিছু ঢাকা মিউজিয়ামে দেওয়া হয়েছে।

লাইব্রেরিতে বসেই গল্পগুজব হতে লাগল। বড় কেতলী করে চা চলে এসেছে। বাটা ভর্তি পান। যার ইচ্ছা চা খাচ্ছে, যার ইচ্ছা পান খাচ্ছে। একদল আবার খেতেও বসেছে। বাড়ির পাশেই শামিয়ানা খাটানো। খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে শামিয়ানার নিচে। এত লোক কোত্থেকে এল সে-ও এক রহস্য।

গল্প করছেন কবি-পত্নী। আমরা শ্রোতা। ভদ্রমহিলার গল্প বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর, মাথা দুলিয়ে হাত-পা নেড়ে গল্প করেন। অত্যন্ত আবেগময় অংশগুলি আবেগশূন্যভাবে বলে যান। শুনতে কেমন কেমন জানি লাগে।

কবি সাহেবের কথা আপনাকে বলি। জমিদারের ছেলে ছিল। রাগ করে সব সম্পত্তি ভাইকে দিয়ে বিবাগী হলো। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তা-ও ভালো লাগে না। জন্ম ভবঘুরে বুঝলেন ভাই ? পথই হলো তার ঘর। কপালের লিখন—বিবাহ হলো আমার সঙ্গে। তখন আবার তার লেখার রোগ মাথাচাড়া দিয়েছে। দিনরাত পড়ে আর লেখে। এই যে বইটা দেখছেন ভাই—এই বই লিখতে কবি সাহেবের লেগেছে সাত বছর। কী কষ্ট করে লিখেছে! বিছানার উপুড় হয়ে বসে লিখত। হাতের কনুই থাকত বিছানায়। ঘষায় ঘষায় কনুই-এ ঘা হয়ে গেল। আমি বাজার থেকে তুলা কিনে এনে দিলাম। সেই তুলার প্যাড কনুই-এ রেখে লিখত। সংসার তখন অচল হয়েছে, বুঝলেন ভাই। সম্পূর্ণ অচল। সে তো সংসারে কিছু দেখে না। চালের দাম কত, আলুর দাম কত—কিছুই জানে না। সংসার টানি আমি। স্কুলের অতি সামান্য আয়ে বাঁচার চেষ্টা করি। কবি সাহেবকে কিছু বুঝতেই দেই না। একদিন কবি সাহেব মন খারাপ করে বললেন, আম্বিয়া, সংসারের জন্যে তো আমি কিছুই করছি না। আমি তাঁকে বললাম, সব মানুষকে আল্লাহ কিছু দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। লেখার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি লেখ। সংসার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-ও ভাবত না। তাঁর ছেলেমেয়ে কয়টা তা-ও বোধহয় সে জানতো না। হাসবেন না ভাই। অতি দুঃখে এই কথা বলছি। একদিন কী হয়েছে শুনুন—আমার মেজো ছেলে অসুস্থ। পেট ফুলে ঢোল হয়েছে। ছটফট করে, নিশ্বাস নিতে পারে না। আমি ছেলেকে কবি সাহেবের পাশে শুইয়ে দিয়ে বললাম তুমি ছেলেটাকে দেখ আমি স্কুলে যাই। স্কুল কামাই দিলে আমার তো চলবে না। স্কুলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি—কবি সাহেব লিখতে বসেছে। পাশে আমার ছেলে—এখন যায় তখন যায় অবস্থা। আমাকে দেখে কবি সাহেব বলল, শোনো আম্বিয়া, তোমার এই ছেলের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত। আমি তার উপর থেকে ভালোবাসার দাবি উঠিয়ে নিয়েছি। তুমিও উঠিয়ে নাও। তোমার ছেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

আমি আঁতকে উঠলাম। কী বলে এই লোক! ছেলেকে কোলে নিয়ে দৌড়ে গেলাম এক কবিরাজের কাছে। রিকশাও নিলাম না। কারণ রিকশাভাড়া ছিল না। সেই ছেলেকে কবিরাজ চিকিৎসা করে ভালো করলেন। একদিন ছেলে চলে গেল আমেরিকায়। সেখান থেকে বাবার জন্যে সোনার কলম পাঠাল। কবি সাহেব সেই কলম পেয়ে খুশি। ডেকে সবাইকে দেখায়।

বুঝলেন ভাই, কবি সাহেব ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ ফেলে নাই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে কী ভালো তার বাবাকে বাসে! আমাকে তারা যত ভালোবাসে তার এক হাজার ভাগের এক ভাগ ভালো আমাকে বাসে না। বাবার কিছু-একটা হলে সব ছেলেমেয়ের খাওয়াদাওয়া বন্ধ।

আরেক দিনের গল্প আপনাকে বলি ভাই। একই সঙ্গে দুঃখের গল্প, আবার হাসিরও গল্প। এই গল্প মনে এলে আমি কখনো হাসি, কখনো চোখের পানি ফেলি। হয়েছে কী শোনেন। এক রাতের কথা—আমি ঘুমাচ্ছিলাম। কবি সাহেব আমাকে ডেকে তুলল। বলল, আম্বিয়া, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখো—কী সুন্দর জোছনা হয়েছে—চলো, জোছনার মধ্যে হাঁটি।

বুঝলেন ভাই ? কথা শুনে আমার ভালো লাগল। এইরকম কথা তো কখনো বলে না। ভালো লাগারই কথা। আমি খুশিমনে কবি সাহেবের সঙ্গে হাঁটতে গেলাম। কবি সাহেব হঠাৎ বলল, দেখো আম্বিয়া, মাঝে মাঝে আমার মনটা খুব খারাপ হয়।

আমি বললাম, কেন ?

যখন শুনি মানুষের ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিক পাশ করে, ভালো রেজাল্ট করে, তখন একটু আফসোস হয়। মনটা খারাপও হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

কবি সাহেব বলল, তখন মনে হয়, আমার যদি এক আধটা ছেলেমেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করত, আমি লোকজনদের বলতে পারতাম।

কী বলছ তুমি ? তোমার যে দুইটা ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। এত ভালো রেজাল্ট করেছে তুমি জানো না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ করেছে জানি না তো! কী আশ্চর্য!

কবি সাহেব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই রকম একটা মানুষের সঙ্গে ঘর করেছি ভাই। সৃষ্টিছাড়া মানুষ। আমি খুশি যে আমার আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মা'র কথা শুনে মেজো মেয়ে রাগী গলায় বলল, মা তুমি এটা কী রকম কথা বললে ? তোমার আগে বাবা মারা যাওয়ায় তুমি খুশি। তোমার এই কথার মানে কী ?

আম্বিয়া খাতুন কঠিন গলায় বললেন, মানে আছে রে মা ? মানে আছে। মানে ছাড়া আম্বিয়া খাতুন কথা বলে না। তোর বাবার আগে যদি আমি মারা যেতাম—কে তাহলে এই পাগল মানুষটার সেবা করত ? আমি বেঁচে আছি বলেই শেষ সময় পর্যন্ত সেবা করতে পেরেছি। আমি বেঁচে আছি বলেই তোর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর নামে ট্রাস্ট করতে পেরেছি। মরে গেলে এইসব হতো না রে মা। বেঁচে আছি বলেই হচ্ছে। তোর বাবার দশ বছরের খাটুনির যে পাণ্ডুলিপি সেটা আমি বেঁচে আছি বলেই প্রকাশ হবে। বেঁচে না থাকলে প্রকাশ হতো না। তোর বাবা সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে কী করত ? বালিশের নিচে রেখে ঘুমাতো। কাউকে মুখ ফুটে বলত না–পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশ করো তো ? বলতো মুখ ফুটে ?

না।

এখন যা, মুখে মুখে আমার সঙ্গে তর্ক না করে—তোর বাবার পাণ্ডুলিপি এনে তোর চাচাকে দেখা।

মেয়েরা ছুটে গেল বাবার পাণ্ডুলিপি আনতে।

আমি পাণ্ডুলিপি দেখলাম। আমি কোনো লিপি বিশারদ নই কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেখে বুঝলাম—বিরাট কাজ হয়েছে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব হারুন-অর-রশিদ সাহেব এই পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেছেন। খুব শিগগিরই তা গ্রন্থাকারে বের হবে।

আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম। গল্পের এক পর্যায়ে তিনি হঠাৎ করে বললেন, ভাই, আপনি কি ভূত-প্রেত এইসব বিশ্বাস করেন ?

আমি বললাম, না।

আমিও করি না। আমি কোনো কিছুই বিশ্বাস করি না। ভূত-প্রেতের নানান ঘটনা শুনি। কিন্তু আমি জানি এর কোনো না কোনো ব্যাখ্যা আছে।

আমি বললাম, অবশ্যই আছে।

আম্বিয়া খাতুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি আমার জীবনের একটা ঘটনা আপনাকে বলব। এই ঘটনার ব্যাখ্যা আমি করতে পারি নাই। কবি সাহেবও পারে নাই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি পারবেন।

এ রকম মনে হওয়ার কারণ কী ?

কোনো কারণ নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে। গল্পটা বলার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। ভাই, আপনি তো অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললেন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি কঠিন ধরনের সাহসী মহিলা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পেরেছি।

আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে আমি কখনো মিথ্যা বলি না?

তা-ও বুঝতে পেরেছি।

তাহলে গল্পটা শুনুন। খুব মন দিয়ে শুনবেন। আজ থেকে কুড়ি বছর আগের কথা। আমার এক কন্যা জেসমিনের বয়স তখন আড়াই বছর। খুব সুন্দর মেয়ে। ফুটফুটে চেহারা। সারা দিন নিজের মনে খেলে, কথা বলে। আমার বড়ই আদরের মেয়ে। একদিন দুপুর বেলা আমি বাথরুমে গিয়েছি। মফস্বল অঞ্চলের বাথরুম—মূল বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, নির্জনে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করা মাত্র আমি একজনের কথা শুনলাম। পুরুষমানুষের গলা। খুব পরিষ্কার স্পষ্ট আওয়াজের কথা। কথাটা সে বলল, ঠিক আমার মাথার ভেতরে। কথাটা হলো—তোমার মেয়ে জেসমিন চৈত্র মাসের বারো তারিখ পানিতে ডুবে মারা যাবে। কিছুই করার নাই। কথা শুনে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি চিৎকার করতে করতে—কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকলাম। কবি সাহেবকে বললাম।

আপনাকে আগে বলা হয় নাই—কবি সাহেব ছিল ঘোর নাস্তিক। সে কোনোকিছুই বিশ্বাস করত না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলল, এটা আর কিছুই না, তোমার মনের বিকার। তোমার মেয়েটা ছোট, পাশেই পুকুর। সারাক্ষণ তুমি মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা করো। এই জন্যে মনে বিকার উপস্থিত হয়েছে। বিকারের ঘোরে এইসব শুনেছ।

কবি সাহেবের কথায় আমার মন শান্ত হলো না। খেতে পারি না। রাতে ঘুমাতে পারি না। চৈত্র মাসের বারো তারিখ আসতে বেশি বাকিও নেই। মনে হলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। কবি সাহেবকে কিছু বলতে গেলে ও শুধু হাসে।

বারোই চৈত্র খুব ভোরবেলা কবি সাহেব আমাকে বলল, তোমার মন যখন এত অস্থির তুমি এক কাজ করো—আজ সারা দিন মেয়েটাকে চোখের আড়াল কোরো না। সারাক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখো। তোমার স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। আমি হেডমিস্ট্রেসের কাছে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে নিয়ে যাব।

কবি সাহেব তা-ই করল। নিজেই একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে নিয়ে গেল। আমি সারা দিন জেসমিনকে নিয়ে রইলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করি না। দুপুরবেলা আমার চোখে মরণঘুম নামল। কয়েক রাত অঘুমো কাটিয়াছি। অবস্থা এমন হয়েছে কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারছি না। ঘুমুতে গেলাম জেসমিনকে নিয়ে। দরজা-টরজা সব বন্ধ করে দিলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। দেখি বিছানায় জেসমিন নেই। বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপরই দেখি সে ঘরের মেঝেতে আপন মনে একটা বদনা নিয়ে খেলছে। মনটা শান্ত হলো। মেয়েটাকে কিছুক্ষণ আদর করলাম। বাইরে থেকে কবি সাহেব বলল, আম্বিয়া, আমার কাছে কিছু মেহমান এসেছেন। একটু চা করতে পারবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চা বানাতে রান্নাঘরে ঢুকলাম। লাকড়ির চুলা ধরতে একটু সময় নিল। যখন আগুন ধরে উঠল তখনি মনে হলো—জেসমিন কোথায়? ওকে না আমার চোখে চোখে রাখার কথা! আমি ছুটে শোবার ঘরে ঢুকলাম। জেসমিন সেখানে নেই। আমি আর অপেক্ষা করলাম না—দৌড়ে গেলাম পুকুরপাড়ে। গিয়ে দেখি—জেসমিন মাঝপুকুরে ভাসছে।

ভাই, আপনি অনেক জানেন। আপনি পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখেছেন, শুনেছেন। আমার এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? কবি সাহেবের মতো ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাকবেন না, কথা বলুন।

আম্বিয়া খাতুনের কঠিন চোখ দ্রবীভূত হলো। তাঁর চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল। তিনি আঁচলে চোখ মুছে মেজো মেয়েকে ডেকে সহজ গলায় বললেন, তোর চাচার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তাঁকে খেতে দে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাউ মন্ত্র

জামালপুর গিয়েছিলাম, আশেক মাহমুদ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মুজিবর রহমান সাহেবের বাসায় দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত। খেতে বসেছি—অনেক আয়োজনের একটি হচ্ছে চিংড়ি মাছ এবং লাউয়ের ঘন্ট। ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী শংকিত গলায় জানতে চাইলেন—লাউ সিদ্ধ হয়েছে কি না। আমি বললাম, হয়েছে। মনে হলো তিনি তবুও নিশ্চিত বোধ করছেন না। পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও বলল, সেদ্ধ হয়েছে। আমি একটু বিস্মিত বোধ করলাম। খেতে ভালো হয়েছে কি না, ঝাল বেশি কি না সাধারণত এগুলো চাওয়া হয়। লাউ সেদ্ধ হয়েছে কি না, সচরাচর জানতে চাওয়া হয় না। কোনো ব্যাপার আছে কি ?

ব্যাপার অবশ্যই আছে। সেটা জানা গেল রাতে গল্পের আসরে। ভদ্রমহিলা একজনের কাছ থেকে ছেলেবেলায় একটা মন্ত্র শিখেছেন। লাউয়ের দিকে তাকিয়ে সেই মন্ত্র পাঠ করলে লাউ সিদ্ধ হয় না। তিনি নাকি অসংখ্যবার পরীক্ষা করেছেন। একবার মন্ত্র পাঠ করবার পর লাউ যতই জ্বাল দেওয়া হোক—নরম হবে না। বরং আরো শক্ত হবে। তিনি যখন লাউ রান্না করেন, মন্ত্র ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন। তবু এক আধবার মনে পড়ে যায়। তিনি তটস্থ হয়ে থাকেন—লাউ বুঝি সেদ্ধ হয় না।

জগতে প্রচুর মন্ত্র-তন্ত্র আছে। বিশ্বকাপ ফুটবলে একটি আফ্রিকান দল সঙ্গে মন্ত্র পড়ার গুণীনও নিয়ে এসেছিল। সেই গুণীন বিংশ শতাব্দীর টিভি ক্যামেরার সামনে মন্ত্র পাঠ করেছে, সাদা রঙের মুরগি কেটে খেলার মাঠে রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রপাঠে শেষ রক্ষা হয় নি—খেলা জেতা হয় নি। ফুটবল খেলা একটা বড় ব্যাপার। এখানে জয়-পরাজয় আছে। জয়-পরাজয় যেখানে আছে সেখানেই মন্ত্র থাকতে পারে। কিন্তু লাউ সেদ্ধ হবে কী সেদ্ধ হবে না, এ নিয়েও যে মন্ত্র থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনি আমাকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, কী সর্বনাশ! না! না!

তিনি যদি অন্য একজনের কাছে শিখতে পারেন, আমিও তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারি। ভদ্রমহিলা আমার এই যুক্তিতে কাবু হলেন না। আমার মন্ত্র শেখা হলো না।

আমাদের দেশে মন্ত্র-তন্ত্রের একটা প্রবল জোর সব সময়ই ছিল। সব বিষয়ে মন্ত্র ছিল। বসন্ত রোগ দূরীকরণ মন্ত্র। বসন্ত রোগ আনয়ন মন্ত্র। সাপে কাটার মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র। বিয়ের মন্ত্র, বিয়ে ভাঙার মন্ত্র।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজার ব্যাপার হলো, একদল শিক্ষিত মানুষ আবার এইসব বিশ্বাস করছেন। শুধু যে বিশ্বাস করছেন তা-ই না—নিজেদের বিশ্বাস অন্যদের মাঝে ছড়ানোর চেষ্টা করছেন।

এই তো সেদিন মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আছি। আমার বড় ভাই স্থানীয় বন্ধু টি এন্ড টির মুনীর আহমেদ সাহেব টেলিফোন করলেন। আমি বললাম, কথা বলতে পারছি না মুনীর ভাই, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা। তিনি বললেন, আপনি টেলিফোন ধরে চুপচাপ বসে থাকুন তো, আমি মাথাব্যথা সারিয়ে দিচ্ছি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কীভাবে সারাবেন?

মেডিটেশন করে সারানো যায়। আমি সিলভা কোর্স নিয়েছি। আপনি টেলিফোন রিসিভার কানে নিয়ে চুপ করে বসুন।

ও আচ্ছা।

ও আচ্ছা না। যা করতে বলছি করুন।

আমি মিনিট পাঁচেক টেলিফোন ধরে বোকার মতো বসে রইলাম এবং এক সময় বলতে বাধ্য হলাম যে আপনার মেডিটেশনে তেমন উপকার হচ্ছে না। যদি কিছু মনে না করেন দুটো প্যারাসিটামল খেয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব।

মুনীর আহমেদ সাহেব একসময় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর মতো আধুনিক মানুষ যদি বিশ্বাস করেন—টেলিফোনে মাথাধরা সারানো যায় তাহলে আমাদের অশিক্ষিত মানুষজন মন্ত্র-তন্ত্র কেন বিশ্বাস করবে না?

মন্ত্রপাঠ করে গনগনে কয়লার আগুনের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য আমেরিকান টিভিতে (NBC) দেখানো হয়েছিল। ব্যাপারটা আমেরিকানদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। একদল সাহেব মন্ত্রতন্ত্রের পক্ষে খুব লেখালেখি শুরু করলেন। তখন 'কেলটেকে'র (California Institute of Technology) বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, পরীক্ষাটা তাঁরাও করবেন। তাঁরা থিওরি বের করলেন, হাঁটার কায়দা বের করলেন। যে কায়দায় হাঁটলে কয়লার তাপ পায়ের পাতা পুড়িয়ে ফেলার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না। হাজার হাজার দর্শকের সামনে এই পরীক্ষাটি কেলটেকের বিজ্ঞানী করে দেখালেন যে গনগনে কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। এসব বিজ্ঞানীর একজন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ড. জাফর ইকবাল। তাঁর কয়লার উপর দিয়ে হাঁটা নিয়ে *দৈনিক বাংলার* ফিচার পাতায় একটি ফিচারও প্রকাশিত হয়েছে।

এইসব ঘটনা মন্ত্র বিশ্বাসী মানুষকে টলাতে পারে না। যে যা বলুক মন্ত্র আছে এই বিশ্বাসে তারা বোধহয় মনে এক ধরনের ভরসা পান। তন্ত্রের মূল উৎপত্তি নাকি কামরূপ কামাখ্যায়। সেটি নাকি নারী রাজত্ব। নারীরা সবাই মন্ত্র-তন্ত্র এবং বশীকরণ বিদ্যায় অতিশয় পটু। তারা সবাই উদ্ভিন্ন যৌবনা এবং পরীর মতো রূপবতী। কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ ওই অঞ্চলে চলে গেলে সহজে জীবন নিয়ে ফিরতে পারে না—অসংখ্য তরুণীর মনোরঞ্জন করতে করতেই তার মৃত্যু হয় (বলাই বাহুল্য—সে মরণও স্বর্গ সমান) তবে কেউ যদি ফিরতে পারে সে মহা সৌভাগ্যবান) কারণ সে তন্ত্র-মন্ত্র শিখে আসে। বাকি জীবনটা তন্ত্র-মন্ত্র ব্যবহার করে সুখেই কাটিয়ে দিতে পারে।

ছোটবেলায় দেখেছি গরুর মন্ত্র জানা গুণীন। বছরের একটা বিশেষ সময়ে এরা উপস্থিত হয়। মন্ত্র পাঠ করে গরুর গায়ে ফুঁ দেয়। এই ফুঁ এমনই জোরালো যে আগামী এক বছর কোনো রোগবালাই গরুকে স্পর্শ করে না। মন্ত্রটা পুরোপুরি আমার মনে নেই, তবে মন্ত্রের শুরু এ রকম :

'গোয়াল ঘরের পাশে
খুকখুক কাশে
ছেলেমেয়েরা হাসে...'

গুণীনরা শুধু যদি মন্ত্রপাঠ করে চলে যেত তাহলে ব্যাপারটা তেমন অসহনীয় হতো না, কিন্তু মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিতান্তই অমানবিক একটা কাজ করে—গরুটাকে হাত পা বেঁধে শুইয়ে লোহা গনগনে গরম করে গরুর গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। চামড়া পুড়ে ধোঁয়া বের হতে থাকে। বেচারা গরু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে।

এ জাতীয় নির্যাতন শুধু যে পশুদের উপর হয় তা না—মানুষের উপরও হয়। খুব শৈশবে দেখা ছবি। গ্রামের একটি তরুণী বধূকে ভূতে ধরেছে। ভূতে ধরলে লজ্জা শরম নাকি থাকে না—মেয়েটি গায়ের কাপড় বারবার ফেলে দিচ্ছে। গ্রামে পর্দা প্রথা কঠিন। কিন্তু ভূত ধরা মেয়েদের জন্যে মনে হয় পর্দা প্রথার কড়াকড়ি তেমন নেই। অনেক পুরুষ মানুষ উঁকি দিয়ে দেখছে। যে ওঝা মন্ত্র পাঠ করছে—সে-ও মাঝ বয়সী। মন্ত্র পাঠ করার ফলে মেয়েটির সারা গায়ে হাত বুলাবার সুযোগ পাচ্ছে। এই কাজটিতে সে আনন্দ পাচ্ছে বলেই মনে হয়। একপর্যায়ে সে মেয়েটির গায়ের সব কাপড় খুলে ফেলল। বড়রা আমাদের তাড়া দিল, পুলাপান কী দেখে ? দূর হও, দূর হও। আমরা দূর হলাম। বড়দের জগতের সব কাণ্ডকারখানা আমরা বুঝি না। দূর হওয়াই ভালো। তা ছাড়া ওঝা এখন শুকনা মরিচ পোড়াতে দিয়েছে—মেয়েটির দুই নাকের ফুটায় জ্বলন্ত শুকনো মরিচ ঠেসে ধরা হবে। এই দৃশ্য না দেখাই ভালো।

আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় একবার এক বৃদ্ধ মহিলা তাঁর কলেজে পড়া নাতিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। নাতিকে খুব লায়েক মনে হলো। তার গায়ে রঙচঙা শার্ট, দিনের বেলাতেও চোখে কালো চশমা। তাঁদের সঙ্গে পেটমোটা কালো ব্যাগ। ভদ্রমহিলা ব্যাগ খুলে নানা কাগজপত্র বের করতে লাগলেন। কাগজপত্রের সঙ্গে আছে পত্রিকার ক্লিপিং, প্রশংসাপত্র। আমি বললাম, ব্যাপার কী ? তিনি বললেন, আগে এইগুলান মন দিয়া পাঠ করেন। পরে কথা বলব। কথার দাম নাই—লেখার দাম আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে কাগজপত্র পড়ে যা জানলাম তা হচ্ছে—তিনি ক্যানসার, এপিলেপ্সি এবং জলাতংক রোগ সারাতে পারেন এবং গ্যারান্টি সহকারে সারান। এই তিন কালান্তর ব্যাধি যিনি সারাতে পারেন তাঁর অবস্থা দেখে মায়া লাগে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। শাড়িতে কোনো তালি চোখে পড়ল না, তবে গায়ের চাদরে তালি।

বুঝলেন ভাইডি, আমি তিন ধরনের চিকিৎসক। আফনেরে ভাই ডাকলাম। আফনে আমার মর্ম বুঝবেন।

আমি বোনের মর্ম তেমন বুঝলাম না। ভদ্রমহিলাকে দেওয়া প্রশংসাপত্র দেখতে লাগলাম। একটি প্রশংসাপত্র জনৈক সিভিল সার্জনের দেওয়া। তিনি লিখেছেন (ইংরেজি ভাষায়)—এই মহিলা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে আক্রান্ত একজনকে সারিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর চাক্ষুষ সাক্ষী। তিনি এই মহিলার সাফল্য কামনা করেন।

যে মানুষ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সারিয়ে তোলে তাকে নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে হৈচৈ পড়ে যাওয়ার কথা। সিভিল সার্জন ভদ্রলোক কোনো হইচই-এ না গিয়ে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

আমি বললাম, আপনি কী করে রোগ সারান? ওষুধপত্র দেন?

ওষুধপত্র আমার কিছু নাই ভাইডি। আমার আছে মন্ত্র।

মন্ত্র পেয়েছেন কীভাবে?

গায়েবিতে পাইছি। আছরের নামাজ পইড়ে জায়নামাজে বইস্যে তসবি টানতেছি তখন গায়েবিতে পাইলাম।

তিন রোগের জন্যে এক মন্ত্র? না তিন রোগের তিন মন্ত্র?

একই মন্ত্র। তয় ভাইডি পড়নের কায়দা ভেন্ন।

আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন?

এইটা কী কথা কলেন ভাইডি? বোন ভাইয়ের কাছে আসবি না?

তা তো আসবেই। তবু আপনার কোনো উদ্দেশ্য থাকলে বলুন।

একটা চিডি যে দেওয়া লাগে ভাইডি। একটা কাগজে লিখে দেবেন—আমার চিকিৎসায় রোগ সারে। তারপরে নাম সই কইরবেন।

আমি বিরস গলায় বললাম, ক্যানসার, এপিলেপ্সি এবং জলাতংক এই তিন রোগের যে কোনো একটা যদি আমার হয়, আপনারে খবর দেব। তারপর আপনি এসে মন্ত্রপাঠ করে আমার অসুখ সারাবেন। তখন আমি প্যাডে সুন্দর করে সার্টিফিকেট দেব।

আমার বোন কথা শুনে রেগে গেলেন। খিটমিটে গলায় বললেন, এতগুলান লোক যে চিডি দেল? এরা কী মিথ্যা দেল? এর মধ্যে একজনায় আছে মন্ত্রী। ওরে, সেকান্দর মন্ত্রীর চিডি উনারে দেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেকান্দর মন্ত্রীর চিঠি বের করে দিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্যাডে প্রশংসাপত্র।

কী, ভাইডি দেখলেন ?

জি দেখলাম।

বিশ্বেস হলো ?

হয় নি।

না হইলে কী আর করা ? জোর কইরে তো বিশ্বাস করানো যায় না ! তা ভাইডি, জোহর হয়েছে—জায়নামাজ দিতে বলেন, নামাজ পড়া লাগবে।

আপনি নিয়মিত নামাজ পড়েন ?

এইটা কী কথা বলেন ভাইডি ? সাত বছর বয়স থেইকে নামাজ পড়ি। একবার অসুখে ক্বাজা গেল। কাফফারা দিলাম।

আমি বললাম, ইসলাম ধর্মে মন্ত্র-তন্ত্র নিষিদ্ধ, তা কি জানেন না ? আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে যারা মন্ত্র-তন্ত্র করে এবং যারা এইসব বিশ্বাস করে তারা কবিরা গুনাহ করে।

সবই জানি ভাইডি। তয় এর মধ্যে বিষয় আছে। তুমি বুঝবা না, তোমার জ্ঞান কম।

আমার বোনকে বিদেয় করতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হলো। বোনের হাঁটুতে বাতের ব্যথা, চিকিৎসা করাবেন। সেই চিকিৎসায় খরচ বাবদ একশ টাকা এবং রিকশা ভাড়া বাবদ দশ টাকা দিতে হলো।

তিনটি কালান্তক ব্যাধির চিকিৎসায় যিনি সিদ্ধহস্ত তাঁকে সামান্য হাঁটুর ব্যথায় কাতর হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলাম।

AMARBOI.COM

সম্প্রতি আমার বাসায় উইপোকার আগমন ঘটেছে। উইপোকা বই কেটে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। নানান ওষুধপত্র দিয়েও তাদের কাবু করা যাচ্ছে না। এরা শুধু যে বই খাচ্ছে তাই না, বইয়ের আলমিরাও খেয়ে ফেলছে। মন খুব খারাপ, এই অবস্থায় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, উইপোকা এম্নিতে দূর হবে না। এরা ভয়াবহ। সব ছারখার করে দেবে। তবে তিনি উইপোকা দূর করার মন্ত্র জানেন। আমি যদি চাই তিনি মন্ত্র পাঠ করে উইপোকা দূর করবেন। আমি বললাম, মন্ত্রে উইপোকা দূর হবে ?

অবশ্যই দূর হবে। মন্ত্র পাঠ করলে রানি উইপোকা মারা যাবে। উইপোকার বংশবৃদ্ধি হবে না।

আপনি কি আগেও উইপোকা দূর করেছেন ?

হ্যাঁ করেছি। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। পরীক্ষা করতে তো আপত্তি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, এক শর্তে আমি পরীক্ষা করতে রাজি আছি—মন্ত্রটা আপনি কাগজে লিখে দিবেন। তারপর মন্ত্র পাঠ করবেন। ভদ্রলোক রাজি হলেন না। মন্ত্র নাকি শেখাতে নেই। এতে মন্ত্রের জোর কমে যায় এবং যে মন্ত্র প্রকাশ করে দেয় তার ক্ষতি হয়।

যা-ই হোক, আমি উইপোকা তাড়াবার মন্ত্র জোগাড় করেছি। যাদের বাসায় উইপোকা আছে তারা এই মন্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। মন্ত্র পাঠের নিয়ম হলো, উইপোকার কিছু মাটি হাতে নিতে হবে, তাতে সমপরিমাণ লবণ মিশাতে হবে। মাটি এবং লবণ মাখতে মাখতে মন্ত্র পাঠ করতে হবে। অবশ্যই মন্ত্র পাঠের সময় শরীর শুদ্ধ হতে হবে। চোখ থাকবে বন্ধ। মন্ত্র পাঠ হলে—লবণ মাখা মাটি উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মন্ত্রে কাজ হয় কি ?

আমার বেলায় হয় নি। তবে আমি অবিশ্বাসী লোক, আমার বেলায় কাজ না হওয়ারই কথা। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

(মন্ত্র)

উত্তর দক্ষিণ সান
বজরং প্রমাণ
উই উই সান ॥
বজরং প্রমাণ
পূর্ব পশ্চিম সান
উই উই প্রমাণ ॥
কালীর দিব্যি ধরি
অহমস্তি ধাম

দুর্জনং বন্দেৎ
পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সান ॥
উই উই প্রমাণ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসাউকি খাতাঁওরা

মধ্যবিত্তদের জীবনে উত্তেজনা সৃষ্টির মতো ঘটনা বড় একটা ঘটে না। তাদের জীবনযাত্রা খাওয়া ঘুমানো এবং টিভি দেখার মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমার ছোটভাইয়ের বাসায় ব্যতিক্রম হলো। তাদের বাসায় উত্তেজনা সৃষ্টির মতো একটা ঘটনা ঘটার উপক্রম হলো। শুনলাম, এক জাপানি যুবক নাকি তার বাসায় একমাস থাকবে। জাপান-বাংলাদেশ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের সে একজন কর্মী, বাংলাদেশের গ্রামে দু'বছর কাটাবে। তবে পোস্টিং হওয়ার আগে বাংলাদেশের কোনো এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে তাকে এক মাস কাটাতে হবে, যাতে সে আমাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পায়।

জাপানি যুবকের জন্যে আমার ছোটভাইয়ের পল্লবীর বাসায় দোতলায় একটা ঘর খালি করা হলো। জানালায় নতুন পর্দা দেওয়া হলো। বিছানায় নতুন চাদর। টেবিলে ফুলদানিতে গোলাপ। বাথরুমে টয়লেট পেপার। বিদেশি অতিথি। আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। এই অতিথি অন্য সব অতিথির মতো নয়। সে হচ্ছে পেইং গেস্ট। যে ক'দিন থাকবে সে-ক'দিনের জন্যে টাকা দেবে। পেইং গেস্ট হলেও তার মূল কাজ আমাদের জীবনযাত্রা লক্ষ করা। আমাদের কালচার সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। যেহেতু বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে সে ধারণা নেবে। কাজেই আমাদের সচেতন থাকতে হবে, কোনো ভুল ধারণা যেন সে না পায়।

তার সন্ধ্যাবেলা আসার কথা। বাসার সবাই বিকেল থেকে সেজেগুজে অপেক্ষা করতে লাগল। বাচ্চাদের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তারা কথাবার্তা কীভাবে বলবে তা-ই নিয়ে মহাচিন্তিত। দোকান থেকে কুৎসিত আকৃতির বিশাল সাইজের মিষ্টি আনা হয়েছে, যাতে বিদেশি অতিথিকে মিষ্টির আয়তন দেখিয়ে ভড়কে দেওয়া যায়।

অতিথি এল সন্ধ্যাবেলা। পায়ে বুটজুতা, পরনে চকচকে সবুজ লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। আমরা তাকে ভড়কাতে চেয়েছিলাম। বিচিত্র পোশাক দিয়ে শুরুতেই সে আমাদের ভড়কে দিল। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে বো করল। একবার না, কয়েকবার। তারপর হাসিমুখে পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমার নাম মাসাউকি খাতাঁওরা। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। শুভ সন্ধ্যা।

আমরা তার পোশাক দেখে মুগ্ধ। তার দুধে আলতা গায়ের রঙ দেখে মুগ্ধ। তার পরিষ্কার বাংলা শুনে মুগ্ধ। জানলাম প্রয়োজনীয় বাংলা সে জাপান থেকেই শিখে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসি-খুশি ধরনের নিতান্তই অল্পবয়স্ক একটি ছেলে। শুনেছি, জাতি হিসেবে জাপানিরা খুব বুদ্ধিমান। একে খানিকটা বেকুব ধরনের মনে হলো। সে প্রথম দিনেই তার বেকুবির অনেকগুলো প্রমাণ দেখাল। বিশাল আয়তনের সাতটি মিষ্টি খেয়ে বলল, মিষ্টিজাতীয় খাবার আমি পছন্দ করি না।

অনেক বাচ্চাকাচ্চা তার জন্যে অপেক্ষা করছে দেখে সে বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়া অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ধরে নিয়ে, ডিগবাজি, পা উপরে মাথা নিচে দিয়ে দাঁড়ানো জাতীয় কিছু খেলা দেখাল এবং এক সময় হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে একটা চায়ের কাপ ভেঙে ফেলে ভাঙা টুকরাগুলোর দিকে খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একটা ময়লা একশ টাকার নোট মা'র দিকে বাড়িয়ে বলল, দয়া করে কাপের দামটা এখান থেকে রাখুন। কাপ ভাঙায় আমি বিশেষ 'দুঃখী' হয়েছি।

সাতদিনের মাথায় সে ঘরের লোক হয়ে গেল। রান্নাঘরে ঘুরঘুর করে। কাঁচামরিচ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। আমার মা অবলীলায় তাকে বলেন, দোকান থেকে আধ কেজি লবণ এনে দাও তো। সে ছুটে যায় লবণ আনতে। মশারি টানানোর জন্যে পেরেক পুঁতে দেয়। একদিন দেখা গেল ঝাড়ু হাতে প্রবল উৎসাহে ঘর ঝাট দিচ্ছে। ভিক্ষুক দরজা ধাক্কা দিলে বলছে—মাফ করো।

বাসার পাশে এক ধোপার দোকানে তাকে দীর্ঘ সময় কাটাতে দেখা গেল। জানা গেল, ধোপাকে সে একশ টাকা দিয়েছে, যার বিনিময়ে ধোপা তাকে তার টু-ইন-ওয়ানটি ব্যবহার করতে দেয়। সে সেখানে জাপান থেকে নিয়ে আসা ক্যাসেটে জাপানি গান শোনে।

তাকে বলা হলো যে, বাসাতেই ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। সে ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারে। তার জবাবে সে বলল, এই বাসায় সে জাপানি ক্যাসেট বাজাতে চায় না। সে বাঙালি কালচার শিখতে চায়।

আমাদের সঙ্গে থেকে সে যেসব কালচার শিখল তা বাঙালি কালচারে পড়ে না। পারিবারিক কালচার হিসেবে চালানো যায়। কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

(১) ঘুমুতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে উঠার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যার যখন ইচ্ছা ঘুমুতে যেতে পারে। কেউ রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আবার অনেকে রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকে। কেউ কেউ ওঠে সূর্য ওঠার আগে এবং প্রার্থনা করে (আমার মা)! কেউ সকাল এগারোটায় অনেক কষ্টে বিছানা থেকে নামে (আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা), এক কাপ চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

(২) দেশের বাড়ি থেকে প্রচুর মেহমান আসে। তখন ঘরের মেঝেতে নানা ধরনের বিছানা করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩) রবীন্দ্র সংগীত, হিন্দি এবং ইংরেজি—এই তিন ধরনের গান সারাক্ষণ ক্যাসেটে বাজতে থাকে। যদিও কাউকে দেখেই মনে হয় না সে গান শুনছে।

মাসাউকিকে দেখে আমরাও জাপানিদের সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা করলাম। যেমন—

ক) জাপানি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ঠিক না। তারা খানিকটা বেকুব ধরনের হয়। (উদাহরণ : একবার বাসায় একটা মিলাদ হলো। মাসাউকি সেখানে উপস্থিত। পাত্রে করে আতর-ভেজানো তুলা দেওয়া হয়েছে। সবাই তুলা থেকে আঙুলে খানিকটা আতর মাখিয়ে নাকে দিচ্ছে। তুলার পাত্র মাসাউকির সামনে আসতেই সে পুরো তুলার টুকরা মুখে দিয়ে কপ করে গিলে ফেলে—হাঁসের মতো গলা টেনে টেনে কাশতে লাগল)

খ) জাপানিরা খাদ্যের ব্যাপারে গোপালের মতো সুবোধ বালক। তাদের যা দেওয়া হয় সবই খায়। তবে তারা নুডলস খায় না। সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে এলু-বার্তা [আলুভর্তা] এবং তিরিকিরি [তরকারি]।

গ) এদের লজ্জাশরম একটু কম। লুঙ্গি পরে থাকে, ফট করে লুঙ্গি খুলে যায় —তারা তাতে মোটেও বিব্রত বোধ করে না। শুধু ইয়েই ইয়েই জাতীয় শব্দ করে।

ঘ) জাপানিরা খুব রঙচঙে আন্ডারওয়ার পরে। মাসাউকির লুঙ্গি প্রায়ই খুলে যাওয়ায় তার বিচিত্র রঙের আন্ডারওয়ার দেখার সৌভাগ্য আমাদের সবারই হয়েছে।

মাসাউকিকে নিয়ে সবচেয়ে সমস্যায় পড়লেন আমার মা। গ্রামে তাঁর যত আত্মীয়স্বজন আছে তারা সবাই জাপানি দেখার অজুহাতে একবার করে ঢাকা ঘুরে গেল। নিতান্ত অসময়ে ছয়-সাতজন এসে উপস্থিত হয়। তাদের মুখভর্তি হাসি। তারা খুশি খুশি গলায় বলে, জাপানি দেখতে আসছি। তাদের সেই দেখা তিন-চারদিনেও শেষ হয় না। তারা জাপানি দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখে, ঢাকা শহর দেখে, বলাকা সিনেমাহলে সিনেমা দেখে। দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বলে, জাপানি দেইখ্যা বড় ভালো লাগল। অতদিন খালি জাপানি জিনিস দেখছি, এখন আল্লাপাক জাপানি আদম দেখাইল। এরার সব ভালো তবে বাংলা ভাষায় একটু দুর্বল।

তারা দেশে ফিরে অন্যদের খবর দেয়। অন্যরা তখন কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ঢাকা রওনা দেয়।

একমাস পার হওয়ার পর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মাসাউকি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। বিদায়দৃশ্য যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হলো। মাসাউকি হড়বড় করে জাপানি ভাষায় একগাদা কথা বলল। মনে হলো, তার মধ্যে গভীর আবেগের সঞ্চার হয়েছে। কারণ কথা বলতে বলতে তার গলা ধরে আসছিল। আমরা যে তার জাপানি ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবর্ণও বুঝতে পারছি না তা তাকে বুঝতে দিলাম না। আমরা সবাই খুব মাথা নাড়তে লাগলাম। মা'র বাসায় কাজের মেয়ে দুজনের একজন গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—মশা ভাইজান যাইতাছে [মাসাউকি বাসার বাচ্চাকাচ্চা এবং কাজের মানুষদের কাছে মশাভাই হিসেবে পরিচিত]।

মাসাউকির বিদায়ের ছ'মাস পরের কথা। কোরবানির ঈদের ছুটিতে আমরা সবাই পল্লবীর মা'র বাড়িতে জড়ো হয়েছি। এই ঈদ সবাই মিলে মা'র সঙ্গে করি—দীর্ঘদিনের নিয়ম। ঈদের দু'দিন আগে স্যুটকেস হাতে নিয়ে মাসাউকি উপস্থিত। দুটো এক শ' টাকার নোট বের করে মা'র কাছে গিয়ে সে যা বলল, তা হচ্ছে, তাকে তিনদিনের ছুটি দিয়েছে। সে আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছে। দু'শ টাকা সে দিচ্ছে খরচ হিসেবে।

মা বললেন, তুমি আমাদের একটা বড় উৎসবের সময় থাকতে এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি থাক। টাকা লাগবে না। এরপর যতবার ছুটি কাটাতে ইচ্ছা করবে চলে আসবে। তবে তোমার থাকতে অসুবিধা হবে। আমার সব ছেলেমেয়েরা চলে এসেছে। বাসা ছোট।

আমার অসুবিধা হবে না। আমি চেয়ারে 'নিদ্রা' করব।

বলেই সে দেরি করল না, বসার সোফায় তার বিছানা পেতে ফেলল। ঈদ উপলক্ষে তাকে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেওয়া হলো। সে নিজে গিয়ে একটা টুপি কিনে আনল। ঈদ উৎসবের নিয়ম-কানুন নিয়েও তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো। সে কোনো নিয়ম বাদ দিতে চায় না।

গরু কেনার ব্যাপারেও তার খুব আগ্রহ দেখা গেল। সে ঘোষণা করল, গরু কেনার সময় সে সঙ্গে যেতে চায় এবং সে গরুর গোশতের একটা জাপানি প্রিপারেশন আমাদের রেঁধে খাওয়াতে চায়।

আমরা তাকে নিয়েই গরু কিনলাম। গরুর দড়ি ধরে হাঁটিয়ে গরু বাসায় নিয়ে আসার পবিত্র দায়িত্বও তার হাতে পড়ল। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! এক জাপানি কোরবানির গরুর দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যে-ই দেখছে সে-ই থমকে দাঁড়াচ্ছে। বুঝতে পারছে না—এই জাপানি সাহেবকে গরুর দাম জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কি না। যেহেতু কোরবানির গরুর দাম জিজ্ঞেস করা পবিত্র দায়িত্বের একটি, কাজেই কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে এবং খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করছে—গরুর দাম কত ?

জাপানি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছে। বো করছে, তারপর গম্ভীর গলায় বলছে—ইহা কোরবানির গরু হয়। ইহার দাম অষ্ট হাজার টাকা।

গরুর দাম যতই বলা হোক, প্রশ্নকর্তাকে বলতে হবে—সস্তা হয়েছে। খুব সস্তা। খুব জিতেছেন।

প্রশ্নকর্তা নিয়মমাফিক অষ্ট হাজার টাকা দাম শুনে বলেন, সস্তা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসাউকি বলল, অবশ্যই সস্তা হয়েছে। বারো হাজার চেয়েছিল। আমরা মূলামূলি করেছি। (মূলামূলি শব্দটি সে সম্প্রতি শুনেছে)।

গাবতলী থেকে পল্লবী—অনেকখানি রাস্তা। সারাপথই মাসাউকি গরুর দাম বলতে বলতে এল। বোঝাই যাচ্ছে এই কাজটায় সে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে।

বাসায় পৌঁছে সে গরুকে পানি খাওয়াল। গা ডলে দিল। পানি দিয়ে গোসল দিয়ে দিল।

আমার মা বললেন, মাসাউকি নিশ্চয়ই কোনো চাষি পরিবার থেকে এসেছে। চাষি পরিবারের ছেলে বলেই গরুর প্রতি এত যত্ন। যত্নটা আমার কাছেও বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো। সন্ধ্যাবেলা গেল—সে কলা কিনে এনেছে। গরুকে কলা খাওয়াচ্ছে। মাথা আঁচড়ানোর চিরুনি দিয়ে গরুর গলকম্বল আঁচড়ে দিচ্ছে।

যথাসময়ে কোরবানি হয়ে গেল। মাংস রান্না হলো। সবাই খেতে বসেছি, মাসাউকির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে রাস্তা থেকে ধরে আনা হলো। জানা গেল, সে রাস্তার পাশে খুব মন খারাপ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মন খারাপের কী কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে জবাব দিল না। বিদেশি অতিথি হিসেবে বিশাল মাংসের বাটি এগিয়ে দেওয়া হলো তার সামনে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, গরুটাকে অনেক দূর থেকে হাঁটিয়ে আনার জন্যে গরুটার উপর তার মায়া পড়ে গেছে। এই গরুর গোশত সে খেতে পারবে না। গোশত না খাওয়ার এই অপরাধে আমরা যেন ক্ষমা করে দেই। সে শুধু পোলাও খাবে। তার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমরা সবাই অবাক হয়ে মাসাউকির দিকে তাকালাম।

ঈদের পরে সে দুদিন রইল। ঘরে এত মাংস—সে একটা টুকরাও মুখে দিল না। দূর দেশের বোকাসোকা একটা ছেলে আমাদের সবার মর্মমূলে বড় ধরনের একটা নাড়া দিয়ে গেল। এর প্রয়োজন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুর সম্পর্কে আমাদের নবীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) একটি হাদিস আছে। হাদিসটি হলো—নবী তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্টির কোনো প্রজাতি না হতো তাহলে আমি কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতাম।

এই হাদিসটি আমাকে বলেন আমার একজন প্রকাশক—কারেন্ট বুকস-এর মালিক—বইপাড়ায় যিনি হুজুর নামে পরিচিত। একদিন তিনি আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় এসেছেন। আমি কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—কুকুর সম্পর্কে আমাদের ইসলাম ধর্ম কী বলে ? হুজুর আমাকে এই হাদিসটি শোনালেন।

কুকুর সম্পর্কে নবীজি এমন কঠিন মনোভাব প্রকাশ করেছেন—আমার জানা ছিল না। অবশ্যি ছোটবেলায় মা'কে দেখেছি কুকুর ঘরে ঢুকলেই দূর দূর করে উঠতেন। কুকুর ঘরে ঢুকলে নাকি ঘর অশুচি হয়। ঘরে ফেরেশতা আসে না। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্পও আছে। ভয়ংকর পাপী এক লোক—তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সে চিঁ চিঁ করে বলল, ওরে, আমি মরতে চাই না রে। তোরা তাড়াতাড়ি একটা কুকুর এনে আমার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দে। লোকটির স্ত্রী অবাক হয়ে বলল, কুকুর বেঁধে রাখলে কী হবে? লোকটি বিরক্ত গলায় বলল, আরে বোকা মাগি, কুকুর বাঁধা থাকলে ফিরিশতা আসবে না। ফিরিশতা না এলে জান কবজ হবে না। সহজ হিসাব।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণী হিসেবে কুকুর গ্রহণযোগ্য না, বিড়াল গ্রহণযোগ্য। ছোটবেলায় নানীজান বলতেন, খবরদার, বিড়ালের গায়ে হাত তুলবি না। বিড়াল নবীজির খুব পেয়ারা জানোয়ার। নবীজি বেড়ালের গায়ে হাত বুলাতেন। ধর্মীয় ট্যাবু সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু কুকুরের আদর বিড়ালের চেয়ে বেশি।

গ্রামের একটি প্রচলিত গল্পে তার প্রমাণ মেলে। গল্পটি হলো, কুকুর সব সময় প্রার্থনা করে গৃহস্থের সাত ছেলে হোক। সাত সাতটা ছেলে হলে তারা ফেলে-ছড়িয়ে ভাত খাবে! সেখান থেকে সে ভাগ পাবে। আর বিড়াল বলে, গৃহস্থ অন্ধ হোক। অন্ধ হলে গৃহস্থ বুঝবে না—কোন খাবার কোথায়। এই ফাঁকে সে খেয়ে যাবে।

কুকুর প্রাণীটির প্রতি আমার তেমন কোনো মমতা নেই। র‍্যাবিজ ক্যারিয়ার হিসেবেই আমি কুকুরকে দেখি। বগুড়ায় আমি জলাতঙ্কের এক রোগীকে দেখেছিলাম। না দেখলেই ভালো ছিল। ভয়াবহ দৃশ্য! রোগীর কষ্টের বর্ণনা দিচ্ছি না। দেওয়া সম্ভবও না। মনে আছে রোগীর বাবা কাঁদতে কাঁদতে সবাইকে বলছিলেন, আপনারা দোয়া করেন যেন আমার ছেলেটা তাড়াতাড়ি মরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশ বছর আগের দেখা ছবি এখনো দুঃস্বপ্নের মতো মনে পড়ে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। যে প্রাণী এই ভয়াবহ ব্যাধির ভাইরাস বহন করে তার প্রতি মমতা থাকার কথাও না। তারপরেও কিছু গোপন ভালোবাসা এই প্রাণীটির প্রতি আমার আছে। আমার সবচেয়ে ছোট ভাইটির জীবন একটি কুকুর তার নিজের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়েছিল। সেই স্মৃতি ভোলা বা ভোলার চেষ্টা করা অন্যায়।

অরণ্যচারী মানুষের প্রথম সঙ্গী হলো কুকুর। মানব জাতির ঊষালগ্নে এই সাহসী পশু তার পাশে এসে দাঁড়াল, মানুষকে শক্তি ও সাহস দিল। মানুষকে বলল, আমি আছি। আমি তোমার পাশেই আছি। এখনো গভীর রাতে কোনো নিঃসঙ্গ মানুষ রাস্তায় হাঁটলে কোত্থেকে একটা কুকুর এসে তার পাশে পাশে চলতে থাকে।

কুকুর প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতার দুটি গল্প বলি :

শহীদুল্লাহ হলে থাকাকালীন ঘটনা। একদিন দুপুরবেলা ঠিক ভাত খাবার সময় কে যেন দরজা ধাক্কাতে লাগল। কলিংবেল টিপছে না, দরজা ধাক্কাচ্ছে—কাজেই ধরে নিলাম ভিক্ষুক। দুপুরবেলা ভাত ভিক্ষা চাওয়ার জন্যে খুব ভালো সময়। আমি দরজা খুলে দেখি বিশাল এক কুকুর। আমাদের দেশি কুকুর এত বড় হয় না। আমি কুকুরটাকে কিছু খাবার দিতে বললাম। খাবার দেওয়া হলো। সে খাওয়াদাওয়া করে চলে গেল। পরদিন আবার এল—সেই দুপুরবেলা। আবারও খাবার দেওয়া হলো। তারপর সে আসতেই থাকল। আমার ছোট মেয়ে একদিন বলল, বাবা দেখ, কুকুটা ঠিক দুটোর সময় আসে।

কুকুরের নিশ্চয়ই হাতঘড়ি নেই। ঘণ্টা-মিনিট মিলিয়ে তার খেতে আসার কথা নয়—দেখা গেল এই কুকুরটা তা-ই করছে। ঠিক দুটোর সময়ই আসছে। সময় সম্পর্কে প্রাণিজগতের নিশ্চয়ই সে রকম কোনো ঘড়ি আছে, যা ব্যবহার করে ঠিক দুটোর সময় চলে আসে।

এই অদ্ভুত ঘটনা কিছু নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবকে দেখিয়ে তাদের চমৎকৃত করা হলো।

ব্যাপার এমন হলো—ঠিক দুটো বাজতেই আমরা অপেক্ষা করি—কখন সে আসবে। সবদিন আসেও না। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে পর পর চার-পাঁচদিন দেখা নেই। তারপর একদিন সে উপস্থিত। দরজায় মাথা দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। ঘড়িতে বাজছে দুটো। কোথায় সে থাকে—তা-ও জানি না। যেখানে থাকুক সে যে কষ্টে নেই তা বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য দেখে। মনে হয় না সে কখনো ক্ষুধার্ত থাকে, কারণ প্রায়ই দেখা গেছে, দুপুরে সে আসছে ঠিকই কিন্তু কিছু মুখে দিচ্ছে না। যেন সে দেখা করার জন্যেই এসেছে। খাবার জন্যে আসে নি।

আমরা কুকুরটার একটা নাম দিলাম, দি ওয়ান্ডারার—পরিব্রাজক। কুকুরদের বাংলা নাম মানায় না বলেই ইংরেজি নাম। তারপর হঠাৎ একদিন দি ওয়ান্ডারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা বন্ধ করে দিল। দুপুর হলেই আমরা অপেক্ষা করি, সে আসে না। দুপুরে কেউ দরজা ধাক্কা দিলে আমার বাচ্চারা ছুটে যায়—না, দি ওয়ান্ডারার না—অন্য কেউ। নানা জল্পনা-কল্পনা হয়—কী হলো ওয়ান্ডারের ? রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ল ? নাকি মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল ?

একদিন আমাদের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল, দি ওয়ান্ডারার এসে উপস্থিত। তার চেহারা ভয়ংকর। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে—চোখ রক্তবর্ণ, কিছুক্ষণ পরপর চাপা গর্জন। কালান্তক র‍্যাবিজ নিয়ে সে উপস্থিত। লোকজনের তাড়া খেয়ে সে ফিরে এসেছে পুরানো জায়গায় এবং আশ্চর্য, এসেছে ঠিক দুপুর দুটোয়। কুকুরের বুদ্ধি এবং কুকুরের আবেগ দিয়ে সে হয়ত ধারণা করেছে এই একটি বাড়িতে তার আশ্রয় আছে। এই বাড়ির লোকজন তাকে কিছু বলবে না। তাকে শান্তিতে মরতে দেবে।

আমরা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছি। দরজার বাইরে দি ওয়ান্ডারার। মাঝে মাঝে তার চাপা হুংকার শোনা যাচ্ছে। সে দরজা আঁচড়াচ্ছে। পিপহোলে চোখ রাখলে তার ভয়ংকর মূর্তি দেখা যায়। আমরা ঘরে আটকা পড়ে গেলাম। হলের দারোয়ানরা খবর পেয়ে লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে এল। দি ওয়ান্ডারারকে হলের সামনে পিটিয়ে মারা হলো—আমি আমার তিন কন্যাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই হত্যাদৃশ্য দেখলাম। দি ওয়ান্ডারার বারবারই তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। তার চোখে ভয় নয়—তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। কিংবা কে জানে সবই হয়তো আমার কল্পনা—হয়তো কুকুররা বিস্মিত হয় না। মানুষদের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুগ যুগ ধরেই তো তাদের পরিচয়। মানুষদের নিষ্ঠুরতায় তারা বিস্মিত হবে কেন ?

আরো একটি কুকুরের কথা বলি। প্রায় তেইশ বছর আগের কথা। আমার বাবার তখন কুমিল্লায় পোস্টিং। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুটিছাটায় কুমিল্লা যাই। ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। সেবারও তা-ই গিয়েছি। ছুটির পুরো সময়টা আমি বাসাতেই থাকি—বই পড়ে এবং গান শুনে সময় কাটাই। গান শোনার রোগ তখন খুব মাথাচাড়া দিয়েছে। বাবা একটি রেকর্ড প্লেয়ার কিনে দিয়েছেন। দিনরাত সেটা বাজে। সবার কান ঝালাপালা।

কুমিল্লায় তখন একটাই রেকর্ডের দোকান। 78 RPM-এর ডিস্ক পাওয়া যায়। একদিন ওই দোকানে গিয়ে রেকর্ড খুঁজছি, বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি, কোনটা নেওয়া যায়। কোনো গানই মনে ধরছে না। হঠাৎ লক্ষ করলাম, দোকানের বাইরে কালো রঙের একটা কুকুর বসে বসে গান শুনছে। হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ডের কুকুরের সঙ্গে এই কুকুরটির খুব মিল। বসেও আছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে। আমি দোকানদারকে বললাম, এই কুকুরটি কি প্রায়ই আপনার দোকানে গান শুনতে আসে ? দোকানদার মহাবিরক্ত হয়ে বলল, কুকুর গান শুনতে আসবে কেন ? কী বলেন এইসব ? দোকানদারের বিরক্তির প্রধান কারণ হচ্ছে—আমি শুধু তার রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনছি না। তা ছাড়া গান শুনতে কুকুর আসে—এই বাক্যটি বোধহয় তাকে আহত করল। রেকর্ডের দোকানের কর্মচারীদের মান-অপমান বোধ তীব্র হয়।

যা-ই হোক, দোকান থেকে বের হয়ে আমি কুকুরটাকে বললাম, গান শুনতে চাইলে আমার সঙ্গে চল। সে আমাকে বিস্মিত করে আমার সঙ্গে রওনা হলো। আমি বাসায় এসে ঘোষণা করলাম, সংগীতপ্রেমিক এক কুকুর নিয়ে এসেছি। গান শুনলে সে পাগল হয়ে যায়। কেউ তেমন উৎসাহ বোধ করল না। আমার ছোটবোন বলল, এমন নোংরা কুকুর সে নাকি তার জীবনে দ্বিতীয়টি দেখে নি। আমি বললাম, লাইফবয় দিয়ে একটা গোসল দিলেই চেহারা ফিরে যাবে। রেকর্ড প্লেয়ার বাজালে দেখবি কী কাণ্ড ঘটে! সংগীতের সে বিরাট সমঝদার।

লাইফবয় সাবান কিনে এনে তাকে গোসল দেওয়া হলো। সে কোনোরকম আপত্তি করলো না। খেতে দেওয়া হলো। খুব অনাগ্রহের সঙ্গে খেল। যেন খাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেশ আয়োজন করে রেকর্ড প্লেয়ারে গান দেওয়া হলো। দেখা গেল গানের প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই। সে হাই তুলে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ছোটবোন বলল, আধুনিক গান বোধহয় সে পছন্দ করছে না। ক্লাসিক্যাল বেইজ-এর কিছু বাজাও। অনেক কিছুই বাজানো হলো। আধুনিক, হিন্দি, গজল, রবীন্দ্রসংগীত। অবস্থার উনিশ-বিশ হলো না। সংগীত-রসিক হিসেবে বাড়িতে ঢুকে সে স্থান করে নিল বেরসিক হিসেবে। তার সব কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রইল খাওয়া এবং ঘুমে। অন্য কিছুই সে করে না। কুকুর সম্প্রদায়ের প্রধান যে দায়িত্ব—অপরিচিত কেউ এলে ঘেউ ঘেউ করা—সেই সামান্য দায়িত্ব পালনেও তার ঘোর অনীহা। অপরিচিত কেউ এলে সে যা করে—তা হচ্ছে—মাথা উঁচু করে খানিকক্ষণ দেখে, তারপর এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে বারান্দায় চলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু পালিয়ে বেড়ায় বলেই তার নাম হলো পলা [এই পলার উল্লেখ আমার প্রথম গ্রন্থ *নন্দিত নরক*-এ আছে। রুনু বলছে—দাদা, আমাদের পলার নাকটা এত ঠান্ডা কেন ?]

খেয়ে খেয়ে এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পলার চেহারা ফিরে গেল কিন্তু সাহস বাড়ল না। বরং সাহস কমে গেল—সে বিড়াল দেখলে ভয় পায়, ইঁদুর দেখলে ভয় পায়। মায়ের পোষা মোরগ নিয়মিত তাকে ঠোকর দিয়ে যায়। সে বিরক্ত হয়, কিন্তু রাগ করে না। ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করে, যার মানে হচ্ছে—কেন বিরক্ত করছ ? দেখছ না ঘুমুচ্ছি ? আমাদের একসময় ধারণা হলো—বেশি খাবার খেয়ে এর এই দশা হয়েছে। পেটে খিদে থাকলে এদের শরীরে রাগ আসে—ঘেউ ঘেউ করে। পলাকে পুরো একদিন উপোস রাখা হলো। তাতে সে মোটেই বিচলিত হলো না। খাবারের সন্ধানে বাইরে কোথাও গেল না। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো—নিয়তিকে সে গ্রহণ করেছে সহজভাবেই। কে জানে সে হয়তো কুকুর সম্প্রদায়ের অতি উঁচু স্তরের একজন সাধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলা নাম বদলে তার নতুন নামকরণ হলো—দি সেইন্ট। ছুটি কাটিয়ে আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। গরমের ছুটিতে আবার গেলাম। এই তিনমাসে দি সেইন্টের, স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে, তবে সাহসের কোনো উন্নতি হয় নি। বাইরের কেউ এলে আগের মতো দৌড়ে ভেতরে চলে আসে। তবে নিজের অধিকার সম্পর্কে সে দেখলাম এবার বেশ সজাগ। যথাসময়ে খাবার না দিলে রান্নাঘরে ঢুকে মা'র শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে। তবে নিজ থেকে কখনো কোনো খাবারে মুখ দেয় না।

সবচেয়ে যা দুঃখজনক তা হলো, গান বাজালে তার ঘুমের অসুবিধা হয় বলে সে বড় বিরক্ত হয়। উঠে চলে যায়।

একদিন এক কাণ্ড হলো। মুরগি কাটা হচ্ছে। দি সেইন্ট থাবা মেলে মা'র মুরগি কাটা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে। এমন সময় টেলিফোন ধরার জন্যে মা মুরগি রেখে ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন দি সেইন্ট ঠিক আগের মতোই থাবা মেলে বসে আছে। কোত্থেকে এক বিড়াল এসে কাটা মুরগি কামড়াচ্ছে। দি সেইন্ট কিছুই বলছে না। সম্ভবত তার ভদ্রতায় বাধছে। মা আমাকে ডেকে বললেন, তুই এই যমের অরুচিকে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে ছেড়ে দিয়ে আয়।

আমি মা'র মতোই রাগলাম এবং দি সেইন্টের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললাম, ফাজিলের ফাজিল—তুমি বিদায় হয়ে যাও। আর কোনোদিন যেন তোমার ছায়া না দেখি। অপদার্থ কোথাকার!

দি সেইন্ট খোলা গেট দিয়ে গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, আপদ বিদেয় হয়েছে। বাঁচা গেছে। ছোট বোন বলল, আপদ মোটেই বিদেয় হয় নি। আপদ হাওয়া খেতে গেছে। হাওয়া খেয়ে ফিরবে। পল ফিরল না। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের খারাপ লাগতে লাগল। আমার মা বললেন, আহা, বেচারা বোকা-সোকা—কোথায় আছে কে জানে? আমি বললাম, যাবে কোথায়, খিদে লাগলে নিজেই আসবে।

দি সেইন্ট এল না। পরদিন আমরা খুঁজতে বেরুলাম। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা দেখা হলো। সে নেই। একটি সামান্য কুকুর আমার কঠিন কথায় মর্মাহত হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার নিজেরও খুব মন খারাপ হলো। ত্রিশ টাকা খরচ করে কুমিল্লা শহরে মাইক দিয়ে ঘোষণা দেওয়া হলো—একটি কালো রঙের দেশি কুকুর হারানো গিয়াছে। কুকুরটার ডান কান সাদা। সে আমলে ত্রিশ টাকা অনেক টাকা। সামান্য কুকুরের জন্যে ত্রিশ টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। তবু খরচ করা হলো। তাতেও লাভ হলো না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় এক বছর পর দি সেইন্ট এল। তবে একা না। তার সঙ্গে চারটি ফুটফুটে বাচ্চা। বাচ্চাগুলো কী যে সুন্দর—শুধু তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছা করে। আমি তখন ঢাকায়। আমাকে টেলিগ্রাম করা হলো—আমি ক্লাস বাদ দিয়ে কুমিল্লায় চলে এলাম। পলার সামনে দাঁড়িয়ে আন্তরিকভাবেই বললাম, পলা, তুমি যে তোমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছ এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি আমার ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত। যতদিন ইচ্ছা তুমি এ বাড়িতে থাকতে পার।

পলা উঠে এসে আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। ঘেউ ঘেউ করে সে তার বাচ্চাগুলোকে কী যেন বলল, বাচ্চারা চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। হয়ত তার মা বলেছে—মানুষটাকে দেখে রাখ। একে যতটা খারাপ ভাবা গিয়েছিল—এ ততটা খারাপ না।

পলা তার বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের বাসাতেই থেকে গেল। তার বাচ্চারা মার মতো হয় নি। এরা সবাই দুর্দান্ত সাহসী। অপরিচিত কেউ আমাদের বাসায় বাচ্চাগুলোর জন্যে ঢুকতে পারত না। তারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! তার চেয়েও অবিশ্বাস্য দৃশ্য হচ্ছে—গান বাজলেই সব ক'টা বাচ্চা এক সঙ্গে ছুটে এসে হিজ মাস্টারস ভয়েসের কুকুরের মতো গম্ভীর ভঙ্গিতে কান উঁচু করে বসে থাকত। তাদের চোখের পলক পড়তো না। যতক্ষণ গান বাজতো ততক্ষণ এরা কেউ নড়তো না।

একজীবনে কত অদ্ভুত দৃশ্যই না দেখলাম!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষাযাপন

কয়েক বছর আগের কথা। ঢাকা শহরের এক কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে খেতে গিয়েছি। চমৎকার ব্যবস্থা। অতিথির সংখ্যা কম। প্রচুর আয়োজন। থালা-বাসনগুলো পরিচ্ছন্ন। যারা পোলাও খাবেন না তাঁদের জন্যে সরু চালের ভাতের ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখলাম বেশ কিছু বিদেশি মানুষও আছেন। তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহী। দেখাবার মতো কোনো অনুষ্ঠান নেই বলে কন্যা-কর্তা খানিকটা বিব্রত। এটা শুধু খাওয়ার অনুষ্ঠান তা বলতে বোধহয় কন্যা-কর্তার খারাপ লাগছে। বিদেশিরা যতবারই জানতে চাচ্ছে, মূল অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে ? ততবারই তাঁদের বলা হচ্ছে, হবে হবে।

কোনার দিকের একটা ফাঁকা টেবিলে খেতে বসেছি। আমার পাশের চেয়ারে এক বিদেশি ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমার কিছুটা মেজাজ খারাপ হলো। মেজাজ খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ—ইনি সঙ্গে করে কাঁটা চামচ নিয়ে এসেছেন। এঁদের এই আদিখ্যেতা সহ্য করা মুশকিল। কাঁটা চামচ নিশ্চয়ই এখানে আছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি আগেও লক্ষ করেছি, যারা কাঁটা চামচ দিয়ে খায়—তারা হাতে যারা খায় তাদের বর্বর গণ্য করে। যেন সভ্য জাতির একমাত্র লগো হলো কাঁটা চামচ। পাশের বিদেশি তাঁর পরিচয় দিলেন। নাম পল অরসন। নিবাস নিউমেক্সিকোর লেক সিটি। কোনো এক এনজিও-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশে এসেছেন অল্প দিন হলো। এখনো ঢাকার বাইরে যান নি। বিমানের টিকিট পাওয়া গেলে সামনের সপ্তাহে কক্সবাজার যাবেন।

কিছু জিজ্ঞেস না করলে অভদ্রতা হয় বলেই বললাম, বাংলাদেশ কেমন লাগছে ?

পল অরসন চোখ বড় বড় করে বলল, Oh, wonderful!

এদের মুখে Oh, wonderful! শুনে আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নেই। এরা এমন বলেই থাকে। এরা যখন এদেশে আসে তখন তাদের বলে দেওয়া হয়, নরকের মতো একটা জায়গায় যাচ্ছ। প্রচণ্ড গরম। মশা-মাছি। কলেরা-ডায়রিয়া। মানুষগুলো খারাপ। বেশির ভাগই চোর। যারা চোর না তারা ঘুষখোর। এরা প্রোগ্রাম করা অবস্থায় আসে, সেই প্রোগ্রাম ঠিক রেখেই বিদেয় হয়। মাঝখানে Oh, wonderful! জাতীয় কিছু ফাঁকা বুলি আওড়ায়।

আমি পল অরসনের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললাম, তুমি যে ওয়ান্ডারফুল বললে, শুনে খুশি হলাম। বাংলাদেশের কোন জিনিসটা তোমার কাছে ওয়ান্ডারফুল মনে হয়েছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল বলল, তোমাদের বর্ষা।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। এ বলে কী! আমি আগ্রহ নিয়ে পলের দিকে তাকালাম। পল বলল, বৃষ্টি যে এত সুন্দর হতে পারে এদেশে আসার আগে আমি বুঝতে পারি নি। বৃষ্টি মনে হয় তোমাদের দেশের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রিকশার হুড ফেলে মতিঝিল থেকে গুলশানে গিয়েছি। আমার রিকশাওয়ালা ভেবেছে, আমি পাগল।

আমি পলের দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, তোমার কথা শুনে খুব ভালো লাগল। অনেক বিদেশির অনেক সুন্দর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার মতো সুন্দর কথা আমাকে এর আগে কেউ বলে নি। এত চমৎকার একটি কথা বলার জন্যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হলো।

পল অবাক হয়ে বলল, আমি কী অপরাধ করেছি?

পকেট থেকে কাঁটা চামচ বের করে অপরাধ করেছ।

পল হো-হো করে হেসে ফেলল। বিদেশিরা এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না বলেই আমার ধারণা। পল অরসনের আরও কিছু ব্যাপার আমার পছন্দ হলো। যেমন—খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, নাও, সিগারেট নাও।

বিদেশিরা এখন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। তারা সিগারেট তৈরি করে গরিব দেশগুলোতে পাঠায়। নিজেরা খায় না। ভাবটা এরকম—অন্যেরা মরুক, আমরা বেঁচে থাকব। তারপরেও কেউ কেউ খায়, তবে তারা কখনো অন্যদের সাধে না।

আমি পলের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। পানের ডালা সাজানো ছিল। পল নিতান্ত পরিচিত ভঙ্গিতে পান মুখে দিয়ে চুন খুঁজতে লাগল। এ ধরনের সাহেবদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। বর্ষা নিয়েই কথা বলা যেতে পারে। তা ছাড়া গরম পড়েছে প্রচণ্ড। এই গরমে বৃষ্টির কথা ভাবতেও ভালো লাগে। আমি বললাম, পল, তোমার বর্ষা কখন ভালো লাগল?

পল অরসন অবিকল বৃদ্ধা মহিলাদের মতো পানের পিক ফেলে হাসিমুখে বলল, সে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছি দুপুরে। প্লেন থেকে নেমেই দেখি প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড গরম। কিছুক্ষণের মধ্যে গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, সর্বনাশ হয়েছে। এই দেশে থাকব কী করে? বনানীতে আমার জন্যে বাসা ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে এয়ারকুলার আছে বলে আমাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে। আমি ভাবছি, কোনোমতে বাসায় পৌঁছে এয়ারকুলার ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকব। ঘরে কোনো চৌবাচ্চা থাকলে সেখানেও গলা ডুবিয়ে বসে থাকা যায়।

বাসায় পৌঁছে দেখি, এয়ারকুলার নষ্ট। সারাই করার জন্যে ওয়ার্কশপে দেওয়া হয়েছে। মেজাজ কী যে খারাপ হলো বলার না। ছটফট করতে লাগলাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি, ফ্যানের বাতাসও গরম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলে এক মিরাকল ঘটে গেল। দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ। আমার বাবুর্চি ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, কালবোশেখি কামিং স্যার। ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। মনে হলো, আনন্দজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝপ করে গরম কমে গেল। হিম-শীতল হাওয়া বইতে লাগল। শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর নামল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বর্ষণ, সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাবুর্চি ইয়াছিন ছুটে এসে বলল, স্যার শিল পড়তাছে, শিল। বলেই ছাদের দিকে ছুটে গেল। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে। ছাদে উঠে দেখি, চারদিকে মহা আনন্দময় পরিবেশ। আশপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে শিল কুড়াচ্ছে। আমি এবং আমার বাবুর্চি আমরা দুজনে মিলে এক ব্যাগ শিল কুড়িয়ে ফেললাম। আমি ইয়াছিনকে বললাম, এখন আমরা এগুলো দিয়ে কী করব?

ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, ফেলে দিব।

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। প্রথম তুষারপাতের সময় আমরা তুষারের ভেতর ছোটাছুটি করতাম। তুষারের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুড়ে দিতাম। এখানেও তা-ই হচ্ছে। সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

আমি পলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

এসো করো স্নান নবধারা জলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

পল বলল, তুমি কী বললে?

রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি লাইন বললাম। তিনি সবাইকে আহ্বান করছেন—বর্ষার প্রথম জলে স্নান করার জন্যে।

বলো কী! তিনি সবাইকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে বলেছেন?

হ্যাঁ।

তিনি আর কী বলেছেন?

আরও অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁর কাব্যের একটা বড় অংশই জুড়ে আছে বর্ষা।

বলো কী!

শুধু তাঁর না, এদেশে যত কবি জন্মেছেন তাঁদের সবার কাব্যের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে বর্ষা।

পল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, বর্ষা নিয়ে এ পর্যন্ত লেখা সবচেয়ে সুন্দর কবিতাটি আমাকে বলো তো প্লিজ।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম,

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।

এই এক লাইন?

হ্যাঁ, এক লাইন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর ইংরেজি কি ?

এর ইংরেজি হয় না।

ইংরেজি হবে না কেন ?

আক্ষরিক অনুবাদ হয়। তবে তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে—

Patter patter rain drops, flood in the river.

পল বিস্মিত হয়ে বলল, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা লাইন।

সাধারণ তো বটেই। তবে অন্যরকম সাধারণ। এই একটি লাইন শুনলেই আমাদের মনে তীব্র আনন্দ এবং তীব্র ব্যথাবোধ হয়। কেন হয় তা আমরা নিজেরাও ঠিক জানি না।

পল হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একসময় বলল, বর্ষা সম্পর্কে এরকম মজার আর কিছু আছে ?

আমি হাসিমুখে বললাম, বর্ষার প্রথম মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু মাছের মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়। তারা পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে।

আশা করি তুমি আমার সঙ্গে লেগ পুলিং করছ না।

না, লেগ পুলিং করছি না। আমাদের দেশে এরকম ফুল আছে যা শুধু বর্ষাকালেই ফোটে। অদ্ভুত ফুল! পৃথিবীর আর কোনো ফুলের সঙ্গে এর মিল নেই। দেখতে সোনালি একটা টেনিস বলের মতো। যতদিন বর্ষা থাকবে ততদিন এই ফুল থাকবে। বর্ষা শেষ ফুলও শেষ।

ফুলের নাম কী ?

কদম।

আমি বললাম, এই ফুল সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হলো—বর্ষার প্রথম কদম ফুল যদি কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দেয় তাহলে তাদের সম্পর্ক হয় বিষাদমাখা। কাজেই এই ফুল কেউ কাউকে দেয় না।

এটা কি একটা মীথ ?

হ্যাঁ, মীথ বলতে পারো।

পল তার নোটবই বের করে কদম ফুলের নাম লিখে নিল। আমি সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের চারটি চরণও লিখে দিলাম।

তুমি যদি দেখা না দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(If thou showest me not thy face,
If thou leavest me wholly aside,
I know not how I am to pass
These long rainy hours.)

পল অরসনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। তবে ঘোর বর্ষার সময় আমি যখন রাস্তায় থাকি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাই, যদি রিকশার হুড-ফেলা অবস্থায় ভিজতে ভিজতে কোনো সাহেবকে যেতে দেখা যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়োময়

বেদনা ও আনন্দময় অভিজ্ঞতার গল্প

নিউমার্কেটে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে দেখা। তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখছেন ?

আমি বললাম, 'অয়োময়' লিখছি।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, সাহিত্য কিছু লিখছেন না ?

এই দিয়েই 'অয়োময়' প্রসঙ্গ শুরু করি। তবে শুরুর আগে বলে নিই, সৈয়দ হকের এই কথায় আমি আহত হয়েছি। টিভির জন্যে নাটক লিখলে সাহিত্য হবে না, মঞ্চের জন্যে লিখলে সাহিত্য হবে, এই অদ্ভুত ধারণা তিনি কোথায় পেলেন কে বলবে। যে 'অয়োময়' আমি টিভিতে দিচ্ছি মঞ্চে তা দিয়ে দিলেই সাহিত্য হয়ে যাবে ? আমি কেমিস্ট্রির ছাত্র, এইসব ব্যাপার বুঝি না, তাঁর মতামত মেনে নিয়েই (!) আজকের লেখা শুরু করি।

অয়োময়ের আগে আরও দুটি 'অসাহিত্য' টিভির জন্যে লিখেছিলাম—এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি। বহুব্রীহি শেষ করার পর একটা বড় কাগজে লেখলাম—এই জীবনে আর ধারাবাহিক নাটক লিখব না। আমার বড় কন্যা সেই লেখা ফ্রিজের গায়ে আটকে দিল। ঠান্ডা পানির জন্যে যতবার ফ্রিজের দরজা খুলি ততবার লেখাটার দিকে চোখ পড়ে। একসময় মনে হলো, সেলফ হিপনোসিস প্রক্রিয়া কাজ করছে—মাথা থেকে ধারাবাহিক নাটকের ভূত নেমে গেছে। ফ্রিজের গা থেকে লেখা তুলে ফেলা হলো। আমি অন্য লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বছর দুই কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ লক্ষ করলাম মাথার গভীর গোপনে এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ করছি। যন্ত্রণার কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না। স্ত্রী এবং তিন কন্যাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলাম। গারো পাহাড় দেখতে যাব, পথে ময়মনসিংহ শহরে থাকলাম। বিকেলে দেখতে গেলাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। মুক্তাগাছার জমিদারের বসতবাড়ি। কলেজের শিক্ষকরা খুব আগ্রহ নিয়ে সব ঘুরে দেখালেন। রাজবাড়ির চারদিকে বিচিত্র সব গাছ। তারা এইসব গাছপালা খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে চেনাতে লাগলেন—

এটা এলাচি গাছ, এটা লবঙ্গ গাছ, এটা দারুচিনি গাছ।

মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল—এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি।

তাঁরা নিয়ে গেলেন পুকুর ঘাটে। কী সুন্দর ডিমের মতো পুকুর। শ্বেত পাথরের কী চমৎকার বাঁধানো ঘাট! পানিতে পা ডুবিয়ে ঘাটে বসেছি। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিল্পকলার শিক্ষক জমিদার সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলছেন, মুগ্ধ হয়ে শুনছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝলেন হুমায়ূন সাহেব, এই জমিদারের তিন স্ত্রী ছিলেন। তাদের একজন বিষ খাইয়ে স্বামীকে হত্যার চেষ্টা করেন। জমিদার সাহেব অনেক চেষ্টা করেন বের করতে—তিনজনের ভেতর কে বিষ দিয়েছে। বের করতে পারেন না। তিনি স্ত্রীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। নতুন ধরনের শাস্তি। তিন স্ত্রীকে সামনে নিয়ে তিনি বসলেন। একটা বিড়ালকে বিষ খাইয়ে তাদের সামনে রাখলেন। তারা দেখলেন কী করে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বিড়াল মারা যায়। জমিদার স্ত্রীদের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এই ঘটনা মাসে একবার করে ঘটতে লাগল।

গল্প শুনে আমি মুগ্ধ। চট করে মাথায় এল—আচ্ছা এদের নিয়ে একটা লেখা লিখলে কেমন হয় ? কিন্তু এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। কেমন ছিল তাদের জীবনচর্যা ? পুরোপুরি কল্পনাকে আশ্রয় করে এগোনো কি ঠিক হবে ? গবেষণা করব, এত সময় কোথায় ?

কখনো যা করি না তা-ই করলাম, ঠিক করলাম কিছু খাটাখাটনি করব, তথ্য জোগাড় করব। ভাটি অঞ্চলের জমিদারদের জীবিত বংশধরদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম—তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন গচিয়া চৌধুরী বাড়ির সালেহ উদ্দিন চৌধুরী এবং বাজিতপুর জমিদার বাড়ির বংশধর হারুনুর রশীদ। খসড়া লেখা তৈরি হলো—পরিকল্পনা উপন্যাস লেখার। ধারাবাহিক নাটকের চিন্তা তখনো মাথায় আসে নি।

AMARBOI.COM

নওয়াজীশ আলী খান

এক দুপুরে টিভি থেকে টেলিফোন করলেন নওয়াজীশ আলী খান। মহা আনন্দিত। আনন্দের কারণ হচ্ছে, তাঁকে টিভি থেকে সরিয়ে নিমকো বা এই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তিনি আবার টিভিতে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, হুমায়ূন ভাই, আসুন চা খেয়ে যান। অনেক দিন আপনার পাগলামি কথাবার্তা শুনি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে আমার পাগলামি কথাবার্তা শোনাবার জন্যে রওনা হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, একটা ধারাবাহিক নাটক করলে কেমন হয় ?

আমি বললাম, উত্তম হয়। কিন্তু আমি তো ভাই প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ধারাবাহিক নাটকে যাব না।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না ?

জি-না।

প্রতিজ্ঞা করা হয় ভাঙার জন্যে, এটা জানেন ?

জানি।

তাহলে আসুন শুরু করা যাক।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আপনার উপন্যাসকে ভিত্তি করে একটা ধারাবাহিক নাটক করি—বড় উপন্যাস আছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, তবে যে-কোনো উপন্যাসকেই আমি টেনে রাবারের মতো লম্বা করতে পারব।

তাহলে একটা নাম দিন, এবং সিনপ্সিস দিন—আজই টিভি গাইডে যাবে।

আমি নাম দিলাম, 'আমিন ডাক্তার'। একটা সিনপ্সিসও লিখে দিলাম—সেই সিনপ্সিস এমন যে, পড়ে কেউ কিছুই বুঝবে না। বাসায় ফিরেই ধারাবাহিক নাটকের প্রথম পর্বটি লিখে ফেললাম। লেখা শেষ হলো রাত তিনটার দিকে। গুলতেকিনকে পড়তে দিলাম। সে পড়ে বলল, নাটকের নাম আমিন ডাক্তার, কিন্তু গল্প তো দেখা যাচ্ছে জনৈক ছোট মীর্জাকে নিয়ে। আমি বললাম, শুরুতে আমিন ডাক্তার অপ্রধান চরিত্রে থাকলেও শেষটায় ঝলসে উঠবেন। গুলতেকিন বলল, নাটক ভালো হয়েছে, তবে নামটা পছন্দ হচ্ছে না। আমি বললাম, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। সে বলল, পৃথিবীর সবকিছু তুমি বোঝ আর কেউ কিছু বোঝে না—এটা মনে করারও কোনো কারণ দেখি না। দুজন দুপাশে ফিরে ঘুমুতে গেলাম।

প্রথম পাণ্ডুলিপি পাঠ

আমার জীবন বন্ধুহীন। মাঝে মাঝে অল্প কিছু সময়ের জন্য দু'একজন বন্ধু-বান্ধব জোটে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ এক বছরের বেশি কখনো থাকে না। আমার তেমনি এক বন্ধু কবি ওবায়দুল ইসলাম আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, প্রথম পাণ্ডুলিপি তাঁর বাসায় পাঠ হবে। সেই উপলক্ষে অনেককে নিমন্ত্রণ করা হলো। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন—আবুল খায়ের, আসাদুজ্জামান নূর, ড. এবং মিসেস এনামুল হক, সপরিবারে আবুল হায়াত। আসরের মধ্যমণি হিসেবে আছেন নওয়াজীশ আলী খান। খাবারদাবারের বিপুল আয়োজন। পাণ্ডুলিপি পকেটে নিয়ে সন্ধ্যার পর সেই বাসায় উপস্থিত হলাম। অতিথিরা সবাই এসে গেছেন, কিন্তু তাদের সবার মুখই শুকনো। কথা বলছেন নিচু গলায়। খবর যা শুনলাম তা ভয়াবহ। ওবায়দুল ইসলাম সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র খেলতে গিয়ে বাঁ চোখে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। চোখে দেখতে পাচ্ছে না বলে বলছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন, চোখের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে। কিছুমাত্র নড়াচড়া না করে দু'সপ্তাহ একভাবে শুয়ে থাকতে হবে। ভাগ্য ভালো হলে রক্ত শরীর শুষে নেবে। ভাগ্য খারাপ হলে...

ছেলেটি শুয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। এই অবস্থায় খাওয়াদাওয়া করা বা পাণ্ডুলিপি পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি বললাম, আজ বাদ থাক, অন্য একদিন পড়া যাবে। নওয়াজীশ আলী খান বললেন, বাদ দিন, বাদ দিন।

গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী রাজি হলেন না। তাঁদের বাড়ির সবাই অভিনয়কলায় বিশেষ পারদর্শী। সবাই এমন ভাব করতে লাগলেন যেন কিছুই হয়নি। চোখে আঘাত পেয়ে দেখতে না-পাওয়া যেন নিত্যদিনের ব্যাপার। তাদের কারণেই খাওয়াদাওয়া হলো, পাণ্ডুলিপি পাঠ হলো। তর্ক-বিতর্ক, মন্তব্য, রসিকতা চলতে লাগল। একসময় বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম, মরার মতো পড়ে থাকা বাচ্চাছেলেটির কথা কারোরই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। প্রথম দিনের আলোচনায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আমিন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন জনাব আবুল খায়ের। নাটকটির নাম বদল করা হবে।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন

নাটকের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সবসময় প্রযোজকই করে থাকেন। নওয়াজীশ আলী খান বললেন, নির্বাচনের ব্যাপারটি আপনাকে নিয়ে করতে চাই। এই নাটকে চরিত্র অনেক বেশি। চরিত্রের মেজাজও বিচিত্র। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হবে।

আমি সঙ্গে রইলাম। দেখা গেল, আমি সঙ্গে থাকায় সমস্যা কমল না, বাড়ল। পছন্দের অভিনেতা-অভিনেত্রী যাকেই নিতে চাই তিনিই না করেন। মদিনার স্বামী হিসেবে মামুনুর রশীদকে নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। তিনি ভদ্রভাবে বললেন—না। মীর্জার ছোট বউ হিসেবে খুব শখ ছিল সুবর্ণাকে নেওয়ার। তিনি বললেন—না। তাঁর না বলার কারণ হচ্ছে, তিনি অন্য একটি ধারাবাহিক নাটক 'গ্রন্থিকগণ কহে'-তে কথা দিয়ে রেখেছেন। ডলি জহুরকেও বলা হলো। তিনি বললেন, মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের একটি সিরিজে তাঁকে কাজ করতে হবে। শান্তা ইসলামকে মদিনার চরিত্রে ভাবা হয়েছিল, তাঁর চরিত্র পছন্দ হলো না। বললেন—বিদেশ যাবেন, কাজেই করতে পারবেন না।

আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু জনাব আবুল হায়াত সাহেবকে যখন কাশেমের চরিত্র করতে বলা হলো তখন তাঁর ফর্সা মুখ কালো হয়ে গেল। চরিত্র পছন্দ নয়। তাঁকে বাসায় গিয়ে নানান কথাবার্তায় ভোলাতে হলো।

ফেরদৌসী মজুমদারকে মা চরিত্রে ভাবা হলো। আমি নিজে এক দুপুরে তাঁকে পরপর তিনটি পর্ব পড়ে শোনালাম। তিনি শুকনো গলায় বললেন, এর মধ্যে অভিনয় করার কী আছে ? যে-কেউ এই চরিত্র করতে পারে।

সাবিহা চরিত্রে মধ্যম মানের একজন অভিনেত্রীকে ডাকা হয়েছিল (ডালিয়া)। তিনিও শুকনো মুখে জানালেন, চরিত্রে অভিনয়ের কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত চরিত্র ঠিক হলো।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম শুনে সবাই বলল—ডুবেছে, এইবার হুমায়ূন আহমেদ ডুবেছে। বিশ বাঁও পানির নিচে পড়ে যাবে। তাদের এ-জাতীয় চিন্তার কারণ হচ্ছে—মীর্জা চরিত্র করছেন আসাদুজ্জামান নূর। যিনি সবসময় হালকা আমোদী ধরনের চরিত্র করেন। মীর্জা চরিত্রের কাঠিন্য আনা তাঁর কর্ম নয়।

দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র করছেন সারা যাকের। টিভি দর্শকরা যাঁকে আগে কখনো পছন্দ করেননি।

আরেকটি প্রধান চরিত্র করছেন আমজাদ হোসেন। সবার ধারণা হলো, তিনি উচ্চগ্রামের অভিনয় করে নাটকে 'আউলা' ভাব নিয়ে আসবেন।

হায়াত সাহেবকে নিয়েও ভয়—মাঝি চরিত্রে তাঁকে মানাবে না।

মুস্তাফিজুর রহমান আমাকে বললেন, মিসকাস্ট হয়েছে। মিসকাস্টের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যায় পড়বেন। এখনো সময় আছে নূরের জায়গায় আলী যাকেরকে নিন। বিশাল দেহ আছে, মানিয়ে যাবে।

আমি বললাম, জমিদারকে কুস্তি করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই—দেখা যাক না।

নৌকা ভাসানোর ব্যবস্থা হলো। ছটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলো এবং পাঠ করা হলো। একেকদিন একেকজনের বাসায়। যে বাড়িতে পাঠ করা হবে সেই বাড়ির দায়িত্ব হচ্ছে চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করা। আমি পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে খেয়ে বেড়াতে লাগলাম। সে বড় সুখের সময়।

ইতিমধ্যে নাম বদল হয়েছে। এখন আর 'আমিন ডাক্তার' নাম নয়। এখন নাম হলো 'অয়োময়'।

এই অদ্ভুত নাম কোথায় পেলাম ? *দেশ* পত্রিকায় একবার একটা কবিতা পড়েছিলাম। কবির নাম অয়োময় চট্টোপাধ্যায়। অয়োময় নামটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। গাঁথুনি থেকে খুলে নিয়ে খানিকটা হালকা করলাম।

কারা কারা অভিনয় করবেন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। সবাই পূর্বপরিচিত। তাঁদের সঙ্গে আগে কাজ করেছি। নতুনের মধ্যে আছেন মোজাম্মেল হোসেন। একদিন নওয়াজীশ আলী খানের অফিসে গিয়ে দেখি বিশালদেহী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। নওয়াজীশ ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেন। তাঁকে মীর্জার লাঠিয়াল চরিত্রে ভাবছি।

আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। অধ্যাপক মানুষ, সামান্য লাঠিয়াল চরিত্র করবেন? চরিত্রও তো তেমন কিছু না। আমি বললাম, ভাই আপনি কাশতে পারেন ? তিনি তৎক্ষণাৎ খুক খুক করে দেখিয়ে দিলেন—'ফলেন পরিচয়তে'।

অয়োময়ের অল্প কিছু ব্যাপার দর্শকরা খুব আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করেছেন—হানিফের কাশি তার একটি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয় কাশার জন্য।

শিল্পীরা অনুষ্ঠানে গান গায়, নাচেন, কবিতা আবৃত্তি করেন—হানিফ সাহেব কাশেন। সেদিন শুনলাম এক ক্যাসেট কোম্পানি হানিফ সাহেবের কাশির একটা ক্যাসেট বের করতে চান। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মদিনা চরিত্রে। আমি নওয়াজীশ ভাইকে বলে দিয়েছিলাম—পাগলের থাকবে অল্পবয়স্কা রূপবতী এক বালিকা বধূ। যে মেয়েকে নেওয়া হলো তার নাম মনে পড়ছে না—সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্রী। চরিত্রের জন্যে মানানসই। একদিন রিহার্সেল দিয়ে সে পিছিয়ে পড়ল। জানাল—নাটক করবে না। শাস্তাকে ভাবা হলো। তিনিও পিছিয়ে পড়লেন। দেখা গেল এই চরিত্র কারোরই পছন্দ নয়। একটা সমস্যায় পড়া গেল।

আহমেদ ছফা তখন এক মহিলাকে পাঠালেন যদি তাঁকে কোনো সুযোগ দেওয়া যায়। তার সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হলো, তিনি পারবেন। আমি তাকে নিয়ে টিভি ভবনে গেলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, হুমায়ূন ভাই, যেহেতু আপনি আমাকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছেন আমার একটি চরিত্র পাওয়া অবশ্যই উচিত, কিন্তু আমার সিক্সথ সেন্স অত্যন্ত প্রবল। আমি জানি এই নাটকে অভিনয় করতে পারব না।

ভদ্রমহিলা রিহার্সেলে অংশগ্রহণ করলেন। কন্ট্রাক্ট ফরমে সই করলেন। আমি তাঁকে হাসিমুখে বললাম, দেখলেন তো আপনার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল নয়।

তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, তাই তো দেখছি, কিন্তু আমি জানি আমার দ্বারা হবে না। বিশ্বাস করুন, আমার সিক্সথ সেন্স অত্যন্ত প্রবল।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভদ্রমহিলার কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য হলো। তাকে নেওয়া হলো না। কেন নেওয়া হলো না তা তাঁকে বলা উচিত ছিল। বলিনি। আজ এই লেখার মাধ্যমে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং স্বীকার করছি, তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আসলেই ভালো।

মদিনা চরিত্রে শেষ পর্যন্ত এলেন—তারানা। আমি সবসময় তাঁর অভিনয়ের ভক্ত। 'বহুব্রীহি' নাটকে তাঁকে নেওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। তিনি রাজি হননি। এইবার রাজি হলেন।

অয়োময় হবে না

সব যখন ঠিকঠাক তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষে থেকে নওয়াজীশ আলী খান আমাকে জানালেন, 'অয়োময়' করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, কারণ কী?

তিনি করুণ গলায় বললেন, কারণ খুব সহজ। টিভির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এই নাটক যা দাবি করছে টিভির পক্ষে তা মেটানো সম্ভব নয়। হাতি, ঘোড়া, ছিপ নৌকা, হাওড়ে দিনরাত শুটিং—অসম্ভব। এই একটি ধারাবাহিকের জন্যে টিভির পক্ষে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। কাজেই বাতিল।

আমি মন খারাপ করে বাসায় বসে রইলাম। আমাকে আরেকটি সহজ নাটক লিখে দেওয়ার জন্য মুস্তাফিজুর রহমান অনুরোধ করলেন। আমি বালকদের মতো অভিমানী গলায় বললাম, না।

আমি যখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে নাটক হবে না, তখন একদিন নওয়াজীশ আলী খান বললেন, সুসংবাদ। টিভি এই নাটকের জন্যে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজি হয়েছে, তবে আপনাকেও আপনার পরিকল্পনার খানিকটা কাটছাঁট করতে হবে। রাজি থাকলে চলুন নৌকা ভাসিয়ে দেই।

আমি বললা, রাজি। খুশি মনে বাসায় ফিরে এসেছি। গুলতেকিনকে বললাম, আয়োময় শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে। সে ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হাসল। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে বলল, আচ্ছা আমি যদি তোমাকে কোনো অনুরোধ করি তুমি রাখবে?

আমি বললাম, অবশ্যই রাখব। কী চাও তুমি?

নাটকটি তুমি এক বছর পিছিয়ে দাও।

সে-কি! কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বেবি এক্সপেক্ট করছি। এই অবস্থায় টেনশন নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি তোমার নাড়ি-নক্ষত্র চিনি। নাটক শুরু হওয়ামাত্র তুমি জগৎ-সংসার ভুলে যাবে। সব সামলাতে হবে আমাকে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, একটা বছর পিছিয়ে দাও।

আমি বললাম, তা তো সম্ভব না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে, খেলা শুরু হয়েছে। তুমি কোনো চিন্তা করবে না। তোমাকে কোনো টেনশন নিতে হবে না—সব টেনশন আমি নেব।

গুলতেকিনের কথা না-শোনার জন্য পরবর্তী সময়ে আমাকে চরম মূল্য দিতে হলো। সেই গল্প একটু পরেই বলব।

অয়োময়ের গান

গান লিখব কখনো ভাবি নি। আমার সবসময় মনে হয়েছে, গীতিকার হওয়ার প্রথম শর্ত সুর, রাগ-রাগিণীর উপর দখল। সেই দখল আমার একেবারেই নেই। কাজেই গান লেখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গান তো লাগবেই। ভাটি অঞ্চলের মানুষ ছ' মাস বসে থাকে। সেই সময়ের বড় অংশ তারা গান-বাজনা করে কাটায়। অয়োময় ভাটি অঞ্চলের গল্প। গান ছাড়া চলবে না। প্রথমে ভেবেছিলাম, সেই অঞ্চলের প্রচলিত গীত ব্যবহার করব। সংগ্রহ করা গেল না। শেষটায় বিরক্ত হয়ে নিজেই লিখতে বসলাম। সুর দেওয়ার জন্য ওমর ফারুককে দেওয়া হলো। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনার লেখা?

আমি চাপা অহংকার নিয়ে বললাম, জি।

ওমর ফারুক বিরক্ত গলায় বললেন, গান লেখার তো আপনি কিছুই জানেন না। মিল কোথায়? সঞ্চারী কোথায়?

সঞ্চারী কোথায় আমি জানি না। কিন্তু মিল তো আছে।

এই মিলে চলবে না।

আমি নরম স্বরে বললাম, কী করে গান লিখতে হয় আপনি শিখিয়ে দিন। আমি দ্রুত শিখতে পারি।

ওমর ফারুক সাহেব শিখিয়ে দিলেন। তাঁর মতো করে গান লিখে দিলাম। তিনি সুর দিয়ে আমাকে শোনালেন। আমি অবিকল তাঁর মতো চোখ কপালে তুলে বললাম, কী সুর দিয়েছেন? শুনতে জঘন্য লাগছে।

কী বললেন, শুনতে জঘন্য লাগছে?

জি।

এই রকম কথা বলতে পারলেন?

আমি মনে কথা রাখতে পারি না। যা মনে আসে বলে ফেলি।

হুমায়ূন সাহেব, আপনার সঙ্গে আমি কাজ করব না। স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনি এক দরজা দিয়ে বের হচ্ছেন, আমি অন্য দরজা দিয়ে। নওয়াজীশ ভাই দুজনকে ধরে এনে মিটমাট করার চেষ্টা করলেন।

ওমর ফারুক সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হুমায়ূন সাহেব, গানগুলি প্রচার হোক, তখন আপনি বলবেন—ওমর ফারুক দি গ্রেট।

গান প্রচার হলো। এ দেশের মানুষ গানগুলো ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমি বলতে বাধ্য হলাম—ওমর ফারুক দি গ্রেট।

অয়োময়ের সবকটি গান আমার লেখা নয়। একটি লিখেছেন সালেহ চৌধুরী—আল্লাহ সবুর করলাম সার। অন্য একটি ওবায়দুল ইসলাম—আসমান ভাইঙা জোছনা পড়ে।

অয়োময়ের গানগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় গান হচ্ছে 'আমার মরণ চাঁদনী পহর রাইতে যেন হয়।' আসলেই আমি চাঁদনী পহর রাতের ফকফকা জ্যোৎস্নায় মরতে চাই। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তেও অসহ্য সুন্দর পৃথিবীকে দেখে যেতে চাই। লেখাটা মনে হয় অন্যদিকে মোড় নিয়ে নিচ্ছে, আগের জায়গায় ফিরে যাই।

যাত্রা শুরু

আউটডোরের কাজ হবে ময়মনসিংহে। ব্রহ্মপুত্র নদী, আমিন ডাক্তার নৌকায় করে ভাটি অঞ্চলে যাচ্ছেন—সারা দিন নৌকা চলেছে। একসময় রাত নামল। আকাশে চাঁদ উঠল। বদরুল গান শুরু করল—

'আসমানে উইঠাছে চান্দি
আমি বসিয়া কান্দি
ভব সমুদ্র একা একা ক্যামনে হব পার ?'

দৃশ্যটি ধারণ করতে ক্যামেরাম্যান নজরুল সাহেব হিমশিম খেয়ে গেলেন। নদীতে প্রবল স্রোত। নৌকা টালমাটাল করছে। নেমেছে বৃষ্টি। ময়মনসিংহের বিখ্যাত বৃষ্টি, একবার শুরু হলে থামার নাম করে না।

রাত তখন একটা। গানের দৃশ্যের চিত্রায়ন শুরু হয়েছে। আমি উৎসাহদাতা হিসেবে অন্য একটি নৌকায় আমাদের আর্ট ডাইরেক্টরের সঙ্গে বসে আছি। হঠাৎ প্রবল স্রোতে নৌকা এগিয়ে চলল। মূল দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ভেসে যেতে লাগলাম। ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না—দূর থেকে ভেসে আসছে বদরুলের গলা (সুবীর নন্দী)—'ভব সমুদ্র একা একা ক্যামনে হব পার।'

আমার জীবনের আনন্দময় মুহূর্তের একটি। আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল রেখে এলাম ব্রহ্মপুত্র নদীতে।

শুটিং শেষ হলো রাত দুটার দিকে। উৎসাহের কারও কোনো কমতি নেই। ভোর হওয়ামাত্র আবার বের হয়ে পড়ললাম। রাজবাড়িতে সেট পড়েছে। পুকুরঘাটে বড় বউ এবং এলাচি বেগম। সারা দিন কাজ হলো। সবার মনে প্রবল উৎসাহ। যে-করেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

হোক একটা ভালো জিনিস করতে হবে। যে-কোনো মূল্যে করতে হবে। আশপাশের সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কত সুখস্মৃতি

'অয়োময়' নিয়ে চমৎকার সব স্মৃতি আছে। কয়েকটা বলি।

মীর্জা সাহেব খবর পেলেন তাঁর সন্তান হবে। মনের আনন্দে তিনি সব পাখি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ক্যামেরা তাঁর মুখের ওপর ধরা। তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তিনি পাখির খাঁচায় হাত ঢুকাচ্ছেন, আর পাখিরা তাকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠোকরাচ্ছে। হাত রক্তাক্ত। মীর্জা সাহেব ব্যথায় চিৎকার করতে পারছেন না—আবার পাখি জোগাড় করা সমস্যা। ছবি নেওয়া শেষ হলো। তিনি রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে চেঁচাতে লাগলেন—বাবা রে, মা রে, গেলাম রে!

নাপিত নিবারণকে পাগল তাড়া করছে—নিবারণ ছুটছে। একসময় সে বুকে হাত দিয়ে বসে গেল। নওয়াজীশ আলী খান ছুটে গেলেন। নির্ঘাৎ হার্ট অ্যাটাক। নিবারণরূপী এ.বি সিদ্দিক ছটফট করছেন, তাঁকে হাওয়া করা হচ্ছে, মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। আমি একটু দূরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। নওয়াজীশ ভাইয়ের মুখ ছাইবর্ণ। মোবারক উচ্চস্বরে কলেমা শাহাদৎ পড়ছে।

দারোগা সাহেব ঘোড়ায় করে এসেছেন—কাশেমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবেন। ঘোড়ার পেছনে একদল গ্রামবাসী। গ্রামবাসীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে এক যুবক এগিয়ে এল, সে রীতিমতো পাংক। মাথা কামানো—মাঝখানে এক চিলতে চুল। নওয়াজীশ আলী খানের মেজাজ গেল বিগড়ে। তিনি তাকে নেবেন না। ছেলে অভিনয় করবেই। শেষ পর্যন্ত রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে তুমি আসো ঘোড়ার পেছনে পেছনে। ছেলে দু' পা এগুতেই ঘোড়া প্রচণ্ড লাথি দিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিল। আমরা বললাম—সাবাস ঘোড়া। পাংকবিহীন দৃশ্য ধারণ করা হলো।

দুঃখময় স্মৃতি

আমার সব ধারাবাহিক নাটকে যা হয়—একদল মানুষ ক্ষেপে যান। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। আমাকে নারীবিদ্বেষী হিসেবে দেখানো হলো। কঠিন সব চিঠি ছাপা হলো। একটি লিখলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা অধ্যাপিকা। একটি সংলাপে মীর্জার মা'র চরিত্রে রূপদানকারী মিসেস দিলারা জামানও আপত্তি করলেন। সংলাপটি হচ্ছে, 'ঢোল, পশু ও নারী—এদের সব সময় মারের উপর রাখতে হয়।'

সংলাপটি দেওয়ার উদ্দেশ্য সমাজে এই সময়ের নারীর অবস্থান বোঝানো। আজ এই কথা কেউ বলবে না, কিন্তু তখন বলত। ময়মনসিংহের একটি প্রবচন হচ্ছে, 'জরু ও গরুকে মারের উপর রাখতে হয়।' তারও আগে যদি যাই তাহলে দেখি রামায়ণেও এই উক্তি আছে। তুলসী দাসের রামচরিত মানসে লেখা—

'ঢোল, গঁবার, শুদ্র, পশু, নারী—এদের মারের উপর রাখতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এ-জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করছি বলেই এটা আমার মনের কথা তা মনে করার কোনো কারণ নেই। 'বহুব্রীহি'তে এমদাদ খোন্দকার বলতেন, 'মেয়েছেলের পড়াশোনার কোনোই দরকার নাই—তারা থাকবে রান্নাঘরে।' এটা এমদাদ খোন্দকারের কথা। আমার না। অথচ শিক্ষিত লোকজন ভেবে বসলেন, প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষ নিয়ে আমি 'অয়োময়' লিখছি। কী অসম্ভব কথা!

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এক অংশ তিন তালাকের একটি দৃশ্যেও খুব আহত হলেন। আমি দেখিয়েছিলাম রাগের মাথায় তিনবার 'তালাক' বললেই তালাক হয় না। তাঁরা বললেন—হয়। অথচ আমি খুব ভালোমতো জেনেশুনেই নাটকে এই দৃশ্য ব্যবহার করেছি। মুসলিম পারিবারিক আইনেও বলা আছে—পরপর তিনবার তালাক বললেই তালাক হবে না। এই আইন বড় বড় আলেমদের সাহায্যে হাদিস কোরআন ঘেঁটে তৈরি করা। আমার বিপক্ষে কঠিন কঠিন সব চিঠি একের পর এক ছাপা হতে লাগল। হায়, একজন কেউ আমার পক্ষে একটি কথা বললেন না।

শেষ কথা

রচনাটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এখন শেষ করা উচিত। সুন্দর কিছু কথা বলে শেষ করলে ভালো হতো। অন্য ধরনের কিছু কথা দিয়ে শেষ করি—

নাটকের চতুর্থ পর্ব প্রচারের পর আমার স্ত্রী একটি অসম্ভব রূপবান ছেলের জন্ম দিলেন। ছেলেটি দু'দিন বেঁচে রইল, তৃতীয় দিনের দিন মারা গেল। শোক ও দুঃখে পাথর হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরেছি। বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদছে। আমার মা'কে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর আমি কী করছি—মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছি অয়োময়ের নবম, দশম পর্ব। আমি দু'দিন পর আমেরিকা চলে যাব। আমাকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে যেতে হবে। নাটক যেন বন্ধ না হয়—'Show must go on.'

লিখতে লিখতে হঠাৎ কী মনে হলো। বিছানায় শুয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকালাম। দেখি সে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো ভাবছে, এই পাষাণ-হৃদয় মানুষটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলো ?

আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম না। মাথায় হাত রাখলাম না। সান্ত্বনার কথাও কিছু বললাম না। আমার হাতে সময় নেই। আমার কাজ শেষ করতে হবে—

'I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.'

একদিন আমার সব কাজ শেষ হবে। চাঁদনী পহর রাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হব। তখন এ জীবনে সঞ্চিত সমস্ত ব্যথার কথা ভেবে চিৎকার করে কাঁদব। আজ আমার কাঁদার অবসর নেই। I have promises to keep.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুত দিন হোয়ে

আমার শৈশবের অনেক সুখস্মৃতির একটি হচ্ছে মা'র সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া। বিপুল উত্তেজনা, বিপুল আয়োজন। সিলেট শহরের নিয়ম অনুযায়ী বাসার সামনে রিকশা এসে থামত। শাড়ি দিয়ে সেই রিকশা পেঁচিয়ে ঘেরাটোপ করা হতো। মহিলারা ঘেরাটোপের ভেতরে। শিশুরা তার বাইরে রিকশার পাটাতনে বসে থাকত। কী আনন্দের দিনই না গিয়েছে। সিনেমাহল পর্যন্ত যাওয়ার আনন্দ, সিনেমাহলের ঘন্টি শোনার আনন্দ, পর্দায় বড় বড় ছবির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুট-বাদাম খাবার আনন্দ।

১৯৬৫-তে পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে গেল। ফলাফল তেমন কিছু হলো না তবে আইন পাস হলো এই উপমহাদেশের কোনো ছবি পাকিস্তানে আসবে না। ভারতীয় ছবি বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময়কার তরুণ-তরুণীরা সুচিত্রা-উত্তমের জন্যে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। তাদের আশা একসময় সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। তখন ছবি দেখা যাবে।

তারপর অনেক দিন পার হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বুড়িগঙ্গার স্বচ্ছ পানি বিষাক্ত হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে—৬৫ সালের আইন কিন্তু বদলায় নি। এখন আমরা ভারত থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারব কিন্তু তাদের ছবি আনতে পারব না।

কারণটা কী?

পাকিস্তানি ভূত আমরা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছি কেন? উত্তর হচ্ছে, দেশের ছবিকে প্রোটেকশন দেওয়া। ভারতীয় ছবি এলে আমাদের ছবি বিকশিত হবে না ইত্যাদি। পঁয়তাল্লিশ বছর আমাদের ছবিকে প্রটেকশন দেওয়ার ফলাফল কী হয়েছে তা সবাই জানেন। এফডিসিতে যেসব রসগোল্লা তৈরি হয়েছে তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় চেখে দেখেন নি।

বাংলাদেশী ছবির প্রযোজকেরা জানেন তারা যা তৈরি করবেন দর্শকদের তা-ই দেখতে হবে। দর্শকদের হাতে কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের ছবির প্রযোজকেরা বলেছেন, ভারতীয় ছবি বাংলাদেশে এলে বাংলাদেশের ছবির বারোটা বেজে যাবে। প্রতিযোগিতায় আমরা টিকতে পারব না। আইন করে আমাদের প্রতিযোগিতার বাইরে রাখতে হবে। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুও আমাদের প্রোটেকশন দিয়েছেন ইত্যাদি। 'সারভাইভাল ফর দি ফিটেস্ট' বলে যে কথাটি আছে আমাদের দেশের চিত্রনির্মাতারা সেটা জানেন না। এই দেশের আইন হলো আনফিটকে সারভাইভ করার সুযোগ দেওয়া। এর চেয়ে হাস্যকর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন যদি লেখকেরা বলেন, আমাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে আমরাও প্রোটেকশন চাই। বাইরের কোনো লেখকের বই বাংলাদেশে আসতে পারবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি সেই প্রোটেকশন দেবেন? নাকি ছবির প্রোটেকশন দিয়ে যাবেন এবং চিত্রনির্মাতারা, 'প্রেম না দিলে লাথি খাবি?' জাতীয় ছবি বানিয়ে যেতে থাকবেন এবং একের পর এক আমাদের সিনেমাহলগুলি মার্কেট হতে থাকবে। সাধারণ মানুষের বিনোদন বন্ধ।

কেউ যেন মনে না করেন হিন্দি ছবি দেখার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি। আমি হিন্দি জানি না এবং হিন্দি ছবির ফর্মুলা পছন্দ করি না। একসঙ্গে তিন শ' নর্তক-নর্তকীর নৃত্য আমাকে আলোড়িত করে না। তবে আমার জীবনে দেখা প্রথম ছবিটি একটি হিন্দি ছবি, নাম 'বহুত দিন হোয়ে'। এই তথ্যটা না জানালে ভুল হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পার হলেও তিনি একটি শুভ উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোন যুক্তিতে একটি শুভ সূচনার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন তা আমি জানি না। আমি তাঁকে পুনর্বিবেচনা করতেও বলব না কারণ বলে কোনো লাভ নেই। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সূর্য। তাকে ঘিরে থাকবে গ্রহ, উপগ্রহ। তারা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাবে। প্রধানমন্ত্রী তাদের কথা এবং পরামর্শ শুনবেন। পত্র-পত্রিকায় যারা লিখবেন তারা গ্রহ-উপগ্রহের বাইরে। কে শুনবে তাদের কথা?

আমি একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে লেখার ইতি টানছি। এক চলচ্চিত্র উৎসবে হঠাৎ করে সত্যজিৎ রায়ের *মহানগর* ছবিটি এসেছে। বলাকা সিনেমাহলে পরপর কয়েকটি শো হবে। আমি তখন মহসীন হলের ছাত্র। টিকিটের জন্যে সারা রাত হলের সামনে লাইন দিয়ে বসে থাকলাম। সকাল এগারোটায় কাউন্টারের সামনে এসে জানলাম টিকিট শেষ। কী কষ্টটাই না পেয়েছিলাম! ১৯৬৫ সালের একটি ভুল আইনের কারণে একটা ভালো ছবি দর্শকরা দেখতে পেল না।

আমি নিজে একজন শখের ফিল্ম মেকার। অনেকগুলি ছবি বানিয়েছি, আরও বানাব, কিন্তু আমি আমার ছবির জন্যে প্রোটেকশন চাইব না। অন্য দেশের ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলে আছে, টিকতে না পারলে নাই।

বাংলাদেশের ছবির জগতে এক ধরনের মনোপলি ব্যবসা চলছে। ইসলাম ধর্মে কিন্তু মনোপলি ব্যবসা নিষিদ্ধ।

যা-ই হোক আমরা পঁয়তাল্লিশ বছর পার করেছি। একসময় এক শ' বছর পার করব। উপমহাদেশের ছবি আমদানি নিষিদ্ধের বছর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব হবে। দুর্ভাগ্যবশত প্রাকৃতিক কারণে সেই উৎসবে আমি থাকতে পারব না। এক শ' বছরের প্রোটেকশন পেয়ে আমাদের ছবি কতদূর চলে যাবে তা দেখার একটা শখ অবশ্যি ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্প কিছুদিনের মধ্যে কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নানান পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা পড়েছি। উনার জন্মশতবার্ষিকী এক বছর আগেই শেষ হয়েছে। তার পরেও একটি পত্রিকা ঘটা করে জন্মশতবার্ষিকী পালন করল। তাতে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। একজন বড় লেখককে সম্মান দেখানো হচ্ছে এটাই বড় কথা। আমাদের মধ্যে সম্মান করা এবং অসম্মান করার দুটি প্রবণতাই প্রবলভাবে আছে। কাউকে পায়ের নিচে চেপে ধরতে আমাদের ভালো লাগে, আবার মাথায় নিয়ে নাচানাচি করতেও ভালো লাগে।

একটা সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নানান অসম্মানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁকে 'বাকবাকুম' কবি বলা হয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এমএ পরীক্ষায় তাঁর রচনার অংশবিশেষ তুলে ধরে বলা হয়েছে—শুদ্ধ বাংলায় লিখ।

ভাগ্যিস উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বাঙালিকে তিনি মাথায় তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশেষ বক্তৃতামালা দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্য হয়েছে।

পশ্চিমা দেশেও (যাদের আমরা সভ্য বলে আনন্দ পাই) এরকম প্রবণতা আছে। তরুণ আইনস্টাইন চাকরি চেয়ে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আবেদনের জবাব পর্যন্ত দেয় নি। আইনস্টাইন অতি বিখ্যাত হবার পর তাঁর চাকরির আবেদনগুলি বাঁধিয়ে অহঙ্কারের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। অহঙ্কারের বিষয় হলো, আইনস্টাইনের মতো লোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদন করেছিলেন।

AMARBOI.COM

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরে যাই। তাঁকে সম্মান দেখানোর আতিশয্যে এক প্রবন্ধকার লিখেছেন, সস্তাধারার জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রকে পেছনে ফেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে গেছেন কত দূর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মানেই পরাবাস্তবতা, জাদুবাস্তবতা ইত্যাদি।

সমস্যা হচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের স্বীকারোক্তি আছে তিনি শরৎচন্দ্রকে কতটা শ্রদ্ধার চোখে সারাজীবন দেখেছেন। গবেষক সরোজ মোহন মিত্র তাঁর *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন, 'মানিকের জীবনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছিল অসীম।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়ে অভিভূত ও বিচলিত হয়েছেন, তা লিখে গেছেন 'সাহিত্য করার আগে' নামের প্রবন্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচারা শরৎচন্দ্রের সমস্যা, তাঁর রচনা সব বাঙালি মেয়েরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে পড়ে। আমাদের ধারণা বহুলোক যা পছন্দ করে তা মধ্যম মাত্রার হবে। কারণ বেশির ভাগ মানুষের মেধা মধ্যম মাত্রার।

বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকদের প্রচুর ইন্টারভিউ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি প্রশ্ন বেশির ভাগ সময়ই থাকে—আপনার প্রিয় ঔপন্যাসিক কে? প্রশ্নের উত্তরে কেউ কখনো শরৎচন্দ্রের নাম দেন না। হয়তো ভয় করেন এই নাম দিলে নিজে মিডিওকার খাতায় নাম উঠাবেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কঠিন গলায় শরৎচন্দ্রের নাম বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কারণ তিনি ভালোমতোই জানতেন তিনি যাই বলেন না কেন তাঁকে 'মিডিওকার' ভাবার কোনো কারণ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আমি একটা লেখা শুরু করেছিলাম। কিছুটা লিখে থমকে গেছি। শুরুটা এরকম—

সেটেলমেন্ট বিভাগের দরিদ্র কানুনগো হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বমোট ১৪টি সন্তান। পঞ্চমটির নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে ডিসটিংশন নিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ দিয়েছে। আইএসসিতে প্রথম বিভাগে পাশ করে অংকে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে।

হরিহর বাবু এবং তাঁর স্ত্রী নীরদা সুন্দরী দেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এই ভেবে যে, পঞ্চমটির একটি গতি হয়ে গেল।

সমস্যা বাঁধাল প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বন্ধু। একদিন ক্লাসের ফাঁকে তুমুল তর্ক। তর্কের বিষয় কোনো কাগজে নবীন লেখকদের লেখা ছাপা নিয়ে। তারা বলছে, নবীন লেখকদের লেখা সম্পাদকরা পড়েনই না।

প্রবোধ একা বলছে, নবীনদের কোনো ভালো গল্প পায় না বলেই ছাপা হয় না। ভালো গল্প পেলেই ছাপবে।

অসম্ভব কথা।

আয় আমার সঙ্গে বাজি রাখ। আমি একটা গল্প লিখে পাঠাব। কোলকাতার সবচেয়ে ভালো পত্রিকা *বিচিত্রা*। *বিচিত্রা*তেই পাঠাব। তারা অবশ্যই ছাপবে।

তুই গল্প লিখবি?

বাজি জেতার জন্যে লিখব। আজ রাতেই লিখব।

অঙ্কের বই সরিয়ে রেখে রাত জেগে গল্প লেখা হলো। গল্পের নাম 'অতসী মামী'। লেখক হিসেবে প্রবোধ তাঁর ভালো নাম না দিয়ে মা তাঁকে যে নামে ডাকতেন সেই নাম দিলেন—মানিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌষ সংখ্যা *বিচিত্রায়* (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'অতসী মামী' প্রকাশিত হলো। লেখকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যের দিবাকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা শুরু 'অতসী মামী'র হাত ধরে।

বিচিত্রা পত্রিকাতেই তাঁর আরো দু'টি গল্প প্রকাশিত হয়। তিনি অঙ্কের বই পুরোপুরি শেলফে তুলে লিখতে শুরু করেন প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'।

সেবছরই তাঁকে কঠিন মৃগী রোগ কব্জা করে ফেলে। লেখার সময় Epilepsy-র আক্রমণ বেশি হয়। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। একসময় জ্ঞান ফিরে, আবার লেখা শুরু করেন। ১৯৩৫ সনে মাত্র ২৭ বছর বয়সে লিখেন, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' দিয়ে। পরিচয়ের ঘটনা বলা যেতে পারে। আমার বাবার পোস্টিং তখন বগুড়ায়। আমি বগুড়া জিলা স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। সেখানকার পাবলিক লাইব্রেরির নাম উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি। লাইব্রেরির অবৈতনিক সেক্রেটারি একজন উকিল। অল্পবয়েসীরা লাইব্রেরি থেকে কী বই নিচ্ছে না নিচ্ছে সেই দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। আমার হাত থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' তিনি কেড়ে নিয়ে বললেন, এই বয়সে মানিক না পড়াই ভালো। বইটা কঠিন। অশ্লীলতাও আছে।

আমি বললাম, বইটা আমি আমার পড়ার জন্যে নিচ্ছি না। বইটা বাবা পড়তে চেয়েছেন। তাঁর জন্যে নিচ্ছি। আমার জন্যে নিয়েছি 'সুন্দরবনের আর্জান সরদার'।

বই নিয়ে বাসায় ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে শুরু করলাম। উপন্যাসের শুরুটা কী অদ্ভুত!

> খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

এই শুরুটা পড়ে আমি কিন্তু বুঝতে পারি নি যে হারু ঘোষের ওপর বজ্রপাত হয়েছে। সে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। উপন্যাসের কী আশ্চর্য শুরু এবং কী আশ্চর্য লেখা।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি কঠিন সমালোচনার মধ্যে পড়েন। কমিউনিস্টরা বললেন, মানিক বাবু মানুষকে পুতুল হিসেবে দেখছেন। নিয়তির হাতের পুতুল। তা হতে পারে না। মানুষই তাঁর নিয়তির স্রষ্টা। একজন লেখক সেই সত্যই লিখবেন। নিয়তির হাতে সব ছেড়ে দেবেন না।

যে যা বলে বলুক, আমার ধারণা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এটি একটি। উপন্যাসটি আমাকে কতটুক আচ্ছন্ন করেছে তার প্রমাণ দেই। আমার

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস 'শ্রাবণ মেঘের দিনে'র প্রধান চরিত্র কুসুম। এই কুসুম এসেছে পুতুলনাচের ইতিকথা থেকে। শশী ডাক্তারের প্রণয়িনী। স্ত্রী শাওনকে আমি ডাকি কুসুম নামে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমি তখন নিজেকে শশী ডাক্তার যে ভাবি না তা কে বলবে!

আমার মেজো মেয়ের নাম শীলা। এই নামটিও নিয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'শৈলজ শিলা' থেকে। গল্পের শেষে তিনি বলছেন—শৈলে যাহার জন্ম, শিলা যাহার নাম সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি কিন্তু রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া উঠে।

তাঁর কোন লেখা কেমন, কোন গ্রন্থে জাদুবাস্তবতা আছে, কোনটিতে নেই, এইসব তাত্ত্বিক আলোচনায় যাব না। সাহিত্যের সিরিয়াস অধ্যাপকদের হাতে এই দায়িত্ব থাকুক। আমি ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি।

নিঃসঙ্গ মানুষটার কোনো বন্ধু ছিল না। এতগুলি বই লিখেছেন, কাউকে কোনো বই উৎসর্গ করেন নি।

এই পর্যন্ত লিখে আমি থমকে গেলাম। অন্যদের মতো আমিও কি মানুষটাকে গ্ল্যামারাইজড করার চেষ্টা করছি না? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বন্ধু নেই। একজন কাউকে পান নি বই উৎসর্গ করার জন্যে, এটা তো তাঁর ব্যর্থতা। কোনো অর্জন না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াশোনা বাদ দিয়ে সাহিত্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেন।—এই বাক্যটাতেও তাঁকে বড় করার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা থাকে। মূল ঘটনা সেরকম না। তিনি দু'বার B.Sc. পরীক্ষা দিয়ে ফেল করার পরই তাঁর ডাক্তার ভাই পড়াশোনার খরচ দেয়া বন্ধ করেন। বাধ্য হয়েই তাঁকে পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়।

তাঁর কঠিন মৃগী রোগের চিকিৎসায় সেই সময়কার সবচেয়ে বড় চিকিৎসক এগিয়ে এসেছিলেন—ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। তিনি তখন শুরু করেন মদ্যপান। এই সময় অতুল চন্দ্র সেনগুপ্তকে এক চিঠিতে লেখেন—

> ডাক্তারের সব উপদেশ মেনে চলা বা সব অষুধ নিয়মিত খাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আজ এখন অষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না। খানিকটা এলকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্যে তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় এলকোহলের আশ্রয় নেয়া ছাড়া গতি কি?

খোঁড়া যুক্তি। যারা মদ্যপান করেন তারা জানেন এই জিনিস কাউকে তাজা করে না। আচ্ছন্ন করে। বোধশক্তি নামিয়ে দেয়।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার খুবই কষ্ট লাগে যখন দেখি এতবড় একজন যুক্তিবাদী লেখক নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন ভুল যুক্তিতে।

তাঁর শেষ সময়ের চিত্র শরৎচন্দ্রের চরিত্রের চিত্রের মতো। তাঁর নিজের লেখা চরিত্রের মতো না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আশ্রয় নিয়েছেন বস্তিতে। তাঁকে ঝাপ্টে ধরেছে চরম দারিদ্র্য, মদ্যপানে চরম আসক্তি এবং চরম হতাশা। তাঁকে দেখতে গেলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অবস্থা দেখে তিনি গভীর বেদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বললেন, এমন অবস্থা! আগে টেলিফোন করেন নি কেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী অস্ফুট গলায় বললেন, তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।

১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মারা যান। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৪৮।

'যদ্যপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ি যায়
তদ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

AMARBOI.COM

[এই লেখাটির জন্যে প্রতীক ও অবসর প্রকাশনার আলমগীর রহমান নানান বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন আমেরিকানের চোখে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব

এই ক্ষুদ্র দেশটির অবস্থান ভারতের পূর্বে। দেশটির দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা। ট্রপিক্যাল জোনের বেনানা বেল্টে এর অবস্থান।

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশের জনগোষ্ঠীর নব্বই শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে দুর্নীতি সম্পর্কযুক্ত। দুর্নীতিতে শীর্ষ সূত্রে প্রায় প্রতিবারেই এই দেশের নাম আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে (বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা) আছে মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগ। যেমন, জঙ্গি মৌলবাদ। এরা দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে প্রায়ই তারা বোমাবাজি করে। দেশটিতে আমেরিকার মতোই প্রধান দু'টি দল। পরস্পরের প্রতি এদের আচরণ অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ। যে দল ক্ষমতায় থাকে না, তার প্রধান লক্ষ্য থাকে হরতাল দিয়ে দেশকে অচল করে দেওয়া। হরতাল মানেই দোকানপাট, গাড়ি ভাঙচুর।

গাড়ি ভাঙা এই দেশের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি তুচ্ছ কারণে এরা শত শত গাড়ি ভাঙচুর করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মীরা এই ধরনের বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে কখনো হস্তক্ষেপ করেন না।

দেশটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। র‍্যাব নামের একটি সংস্থা এ দেশে আছে, তারা যে-কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে। তার জন্যে তাদের জবাবদিহিতার ভেতর দিয়ে যেতে হয় না। এইসব হত্যাকাণ্ডের নাম 'ক্রসফায়ার'। সঙ্গতকারণেই এদের পোশাক ফাঁসির জল্লাদদের পোশাক। তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে কালো চশমা পরে এবং কালো রুমালে মাথা ঢেকে রাখে।

দেশ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হলো। এখন এই দেশের রাজধানী ঢাকা শহরের মানুষদের বর্ষবরণ উৎসব পালনের কথা বলব। শুরুতেই বলে নিচ্ছি, এই দেশটিতে সরকারিভাবে কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয় না। এই ক্যালেন্ডারের ব্যবহার বিভিন্ন উৎসবের দিন নির্ধারণে। বাংলা ক্যালেন্ডারে নববর্ষ হলো বৈশাখের প্রথম দিন। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে এপ্রিলের ১৪ তারিখ।

দিনটি ছিল অসম্ভব গরম। তাপমাত্রা তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূর্যের প্রখর উত্তাপ। আমি একটা রিকশা নিয়ে বনানী থেকে শহর-কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছি। রিকশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে পেশিশক্তিতে চালিত একটি যান। এদের সচল চিত্রশালাও বলা যায়। কারণ প্রতিটি রিকশার পেছনে বহুবর্ণ পেইন্টিং আছে। আমি যে রিকশায় চড়েছি, সেখানে একটি বাঘের ছবি আছে। বাঘের মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। তার সামনে আছে একটা ট্রেন।

আমার রিকশাওয়ালার নাম হামিদ। সে একজন হাসিখুশি যুবক। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের সবাই হাসিখুশি। আন্তর্জাতিক একটি জরিপে বাংলাদেশ বিশ্বের সুখী দেশ হিসেবে শীর্ষ অবস্থানে স্থান করে নিয়েছে।

আমি হামিদকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললাম, তুমি আজ আমার গাইড। তুমি আমাকে তোমাদের বর্ষবরণ উৎসব দেখাবে।

হামিদ ইংরেজিতে বলল, ইয়েস স্যার। তার ইংরেজি জ্ঞান ইয়েস এবং নো-তে সীমাবদ্ধ। এতে অবশ্যি আমাদের ভাবের আদান-প্রদানে অসুবিধা হলো না। সে আমার অদ্ভুত বাংলা বুঝতে পারছে।

হামিদ বলল, আপনি স্যার আসল জিনিস মিস দিলেন। সূর্য উঠার আগে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। রমনা বটমূলে। কী সুন্দর গান যে হয়! গান শুনলে চোখে পানি আসে।

তুমি শুনেছ ?

তিনবার শুনেছি। তিনবারই চোখের পানি ফেলেছি। প্রথমবার অনেক বেশি, পরের দুইবার কম।

এইবার গান শুনতে যাও নাই কেন ?

পেটের ধান্ধায় যাই নাই। ট্রিপে না গেলে ঘরে উপাস থাকব। সংসারে অনেক খানেওয়ালা—আমার মা, পরিবার আর দুই মাইয়া।

তারা কোথায় ?

সক্কালবেলায় এরারে গান শুনতে নামায়া দিছি। দুপুরে একসাথে পান্তা খাব। এরা সইন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব, তারপর ঘরে ফিরব।

পান্তা জিনিসটা কী ?

পানিভাত। নববর্ষে পান্তাভাত ইলিশ মাছ ভাজা দিয়া খাইতে হয়। আমাদের নিয়ম।

নিয়ম ?

জি স্যার, আমরা কঠিন নিয়মের মানুষ। নিয়মের বাইরে যাই না।

তোমাদের আর কী নিয়ম ?

পোশাকে নিয়ম আছে। ফাল্গুন মাসের এক তারিখে মেয়েদের পরতে হয় হলুদ শাড়ি। আজ পরতে হয় লাল শাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়ি বিষয়ে বলি। শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের প্রধান পোশাক। এটা ছয় গজ লম্বা ও সোয়া গজ প্রস্থের একখণ্ড বর্ণিল বস্তু। মেয়েরা প্রথমে স্কার্ট ও টপস পরে, তারপর শাড়ি দিয়ে স্কার্ট টপস ঢেকে দেয়। টপসকে এরা বলে 'ব্লাউজ' এবং স্কার্টকে বলে 'শায়া'। কোনো বোতাম বা ফিতা ছাড়াই অদ্ভুত এক উপায়ে এ দেশের মেয়েরা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে রাখে। আমাকে বলা হয়েছে, শাড়ি গা থেকে খুলে পড়ার ঘটনা কখনোই ঘটে না।

হামিদ ঝড়ের গতিতে রিকশা চালাচ্ছে। আমি বললাম, এত তাড়া কিসের! আস্তে চালাও। এক্সিডেন্ট করবে।

হামিদ বলল, তাড়াতাড়ি না গেলে আরেকটা জিনিস মিসিং হবে।

কী জিনিস ?

আর্ট কলেজের পুলাপান এই দিনে পাগলা মিছিল বাইর করে। তারা পাগলা তো, এই কারণে তারার মিছিলও পাগলা। না দেখলে জেবন বৃথা।

পাগলা মিছিল দেখলাম। মুখোশ মিছিল। উদ্দাম আনন্দের শোভাযাত্রা। ব্রাজিলের সাম্বা উৎসবের শোভাযাত্রার সঙ্গেই কেবল এই মিছিল তুলনীয়।

হামিদ মিয়া এক চটপটির দোকানের পাশে তার রিকশা জমা রেখে আমাকে নিয়ে রমনা উদ্যানে ঢুকল। উদ্যানে বৃক্ষের অরণ্যের ভেতর সুখী মানুষের অরণ্য। কত না তাদের আনন্দ! বাবার কাঁধে শিশু ভেঁপু বাজাচ্ছে। মা কাঁচের চুড়ি কিনছে। (এই উৎসবে মেয়েদের কাচের চুড়ি কেনা নাকি বাধ্যতামূলক।)

রিকশাওয়ালা তার পরিবারকে খুঁজে বের করল। হতদরিদ্র এই পরিবারটিরও আনন্দের সীমা নেই। হামিদের দুই মেয়ে মাটির খেলনা কিনেছে। শিশুদের মাটির খেলনা কিনে দেওয়াও নববর্ষ অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

হামিদ আমাকে পান্তা খেতে নিয়ে গেল। সে বলল, স্যারের পান্তার টেকা আমি দিমু। স্যার আইজ আমার মেহমান।

হামিদের পরিবারের সঙ্গে আমি মাটির হাঁড়িতে পান্তা খেতে বসলাম। হামিদ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইলিশ মাছের একটা বড় টুকরা যেন আমি পাই।

আমি আমেরিকান। আমেরিকানরা আবেগশূন্য না। তবে আবেগে আমেরিকানদের চোখ কখনো ভিজে ওঠে না। আমি লক্ষ করছি, আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠছে। যে দেশের মানুষ দুঃখ-কষ্ট-হতাশা-বঞ্চনা একপাশে ফেলে আনন্দে মেতে উঠতে পারে, সে দেশের মানুষ অনেকদূর যাবে তা বলাই বাহুল্য। থ্রি চিয়ারস ফর দেম! হিপ হিপ হুররে!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাদটীকা (কিছু তথ্য)

বঙ্গদেশে নববর্ষ উৎসব ছিল না। ছিল চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বসু তাঁর স্কুলে নববর্ষ পালনের ব্যবস্থা করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করেন শান্তিনিকেতনে।

বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) নববর্ষ পালনের সূচনা হয় কবি জাহানারা আরজুর বাসায়, ১৯৬৪ সালে। সেখানে তরুণ কবি হাসান হাফিজুর রহমান বৈশাখ নিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর নববর্ষ উদ্‌যাপন বন্ধ হয়ে যায়।

রমনা বটমূলে প্রভাতের সূর্যোদয়ের সঙ্গে নববর্ষ উদ্‌যাপনের শুরু করে ছায়ানট।

আরেকটি তথ্য, একমাত্র নেপাল ছাড়া বাংলা ক্যালেন্ডার সরকারিভাবে পৃথিবীর কোথাও ব্যবহার করা হয় না।

অতি অদ্ভুত এক মিল আমরা খুঁজে পাই পাঞ্জাবিদের বৈশাখী উৎসবের সঙ্গে। তারাও পহেলা বৈশাখ পালন করে নতুন বর্ষের প্রথম দিবস হিসেবে। বিস্তারিত আমার জানা নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষিদ্ধ গাছ

ধ্রুব এষের সঙ্গে আমার সখ্য দীর্ঘদিনের। তার চুল-দাড়ি, হাঁটার ভঙ্গি, পোশাক এবং জীবনচর্যা সবই আলাভোলা। তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্প হচ্ছে, নিজের বিছানা কারও সঙ্গে 'শেয়ার' করা সম্ভব না বলে সে চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আত্মীয়-বন্ধুদের চাপে শেষটায় শর্তসাপেক্ষে বিয়েতে রাজি হয়। শর্ত হচ্ছে, তার স্ত্রী সারা দিন তার সঙ্গে থাকতে পারবে, কিন্তু সূর্য ডোবার পরপর বেচারিকে তার মায়ের বাড়িতে চলে যেতে হবে। ধ্রুব বিয়ে করেছে। শোনা যায়, তার স্ত্রী শর্ত মেনে নিয়েছে এবং এই দম্পতি সুখেই আছে।

যা-ই হোক, ধ্রুবের কাছ থেকে শোনা একটি লোকগল্প দিয়ে রচনা শুরু করা যাক।

মহাদেব স্বর্গে নন্দি ভৃঙ্গিদের নিয়ে আছেন। মহাদেবের মনে সুখ নেই, কারণ কোনো নেশা করেই আনন্দ পাচ্ছেন না। তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন নেশার বস্তুর সন্ধানে। দেখা করলেন লোকমান হেকিমের সঙ্গে। যদি লোকমান হেকিম কিছু করতে পারেন। ইনিই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে গাছপালারা কথা বলে। মহাদেব ও লোকমান হেকিম বনেজঙ্গলে ঘুরছেন, হঠাৎ একটা গাছ কথা বলে উঠল। গাছ বলল, লোকামন হেকিম, আমি গাঁজাগাছ। আমাকে মহাদেবের হাতে দিন। মহাদেবের নেশার বাসনা তৃপ্ত হবে। মহাদেব গাঁজাগাছ নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। গাঁজাগাছই একমাত্র গাছ যা পৃথিবী থেকে স্বর্গে গেল।

এই গাঁজাগাছ আমি প্রথম দেখি বৃক্ষমেলায় বন বিভাগের স্টলে। নুহাশপল্লীর ঔষধি বাগানে এই গাছ নেই। আমি কিনতে গেলাম। আমাকে জানানো হলো, এই গাছ নিষিদ্ধ। আনা হয়েছে শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্যে। অনেক দেনদরবার করেও কোনো লাভ হলো না।

আমি গাঁজাগাছ খুঁজে বেড়াচ্ছি, এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ তাদের দলে ভিড়েছি বলে বিমল আনন্দ পেলেন, আবার কেউ কেউ আমার দিকে বক্রচোখে তাকাতে লাগলেন। 'Thou too Brutus' টাইপ চাউনি।

জনৈক অভিনেতা (নাম বলা যাচ্ছে না, ধরা যাক তার নাম পরাধীন) আমাকে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি গাঁজাগাছ খুঁজে পাচ্ছেন না এটা কেমন কথা! আমাকে বলবেন না? আমি তো গাঁজার চাষ করছি।

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, কোথায় চাষ করছ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে। আমার অনেক টব আছে। ফ্রেশ জিনিস পাই। ফ্রেশ জিনিসের মজাই আলাদা।

আমি বললাম, তুমি গাঁজার চাষ করছ, তোমার স্ত্রী জানে ?

না। তাকে বলেছি, এগুলি পাহাড়ি ফুলের গাছ। টবে পানি আমার স্ত্রী দেয়।

পরাধীনের সৌজন্যে দুটা গাঁজাগাছের টব চলে এল। যেদিন গাছ লাগানো হলো তার পরদিনই চুরি হয়ে গেল। বুঝলাম, যে নিয়েছে তার প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশি।

গাঁজার চাষ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। গাঁজা খাওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চয়ই নিষেধাজ্ঞা আছে। বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ডবুকে (গাজী শামসুর রহমান) প্রকাশ্যে সিগারেট খেলে ১০০ টাকা শাস্তির কথা বলা হয়েছে। গাঁজা বিষয়ে কিছু পেলাম না। প্রকাশ্যে থুথু ফেললেও ১০০ টাকা জরিমানা। রমজান মাসে মুসল্লিদের থুথু ফেলায় কি আইন শিথিল হবে ?

গাঁজা খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সরকার মনে হয় নমনীয়। মাজার মানেই গোল হয়ে গাঁজা খাওয়া। লালনের গান শুনতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহ্‌র মাজারে গিয়েছিলাম। গাঁজার উৎকট গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। এর মধ্যে একজন এসে পরম বিনয়ের সঙ্গে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'স্যার, খেয়ে দেখেন। আসল জিনিস। ভেজাল নাই।' সিগারেটের তামাক ফেলে গাঁজা ভরে এই আসল জিনিস বানানো হয়েছে।

গাঁজাগাছ সম্পর্কে কিছু তথ্য। আমার লেখা *বৃক্ষকথা* নামের বইয়ে বিস্তারিত আছে। এই বইটি অন্যপ্রকাশ থেকে বের হয়েছে। প্রথম দিনের বিক্রি দেখে 'অন্যপ্রকাশ'-এর স্বত্বাধিকারী মাজহার অবাক। দ্বিতীয় দিনে অদ্ভুত কাণ্ড। যারা বই কিনেছে, তারা সবাই বই ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। তারা হুমায়ূন আহমেদের কাছে গল্প চায়। বৃক্ষবিষয়ক জ্ঞান চায় না। হা হা হা।

গাঁজাগাছের বোটানিক্যাল নাম *Canabis sativa* Linn। গোত্র হলো Urticacea.

গাঁজাগাছের স্ত্রী-পুরুষ আছে। দুটিতেই ফুল হয়। তবে পুরুষ-গাছের মাদকক্ষমতা নেই।

স্ত্রী-গাছের পুষ্পমঞ্জুরি শুকিয়ে গাঁজা তৈরি হয়। এই গাছের কাণ্ড থেকে যে আঠালো রস বের হয় তা শুকালে হয় চরস। চরস নাকি দুর্গন্ধময় নোংরা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে খেতে হয়।

স্ত্রী-গাঁজাগাছের পাতাকে বলে ভাং। এই পাতা দুধে জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় ভাঙের শরবত, অন্য নাম সিদ্ধির শরবত। এই শরবত ভয়ঙ্কর এক হেলুসিনেটিং ড্রাগ।

আমার বন্ধু আর্কিটেক্ট করিম ভাঙের শরবত খেয়ে কলকাতার এক হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে ছিল। তার কাছে মনে হচ্ছিল, তার দুটা হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। হোটেলের জানালা দিয়ে সেই হাত বের হয়ে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে।

গাঁজাগাছের ফুল, ফল, পাতা এবং গা থেকে বের হওয়া নির্যাসে আছে সত্তরের বেশি ক্যানাবিনয়েডস্। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো ক্যানাবিনল, ক্যানাবিডিওল, ক্যানাবিডিন। নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ (Alkaloids)ও প্রচুর আছে।

এইসব জটিল যৌগের কারণেই মাদকতা ও দৃষ্টিবিভ্রম।

যে বস্তু শিব নন্দি ভৃঙ্গিকে নিয়ে হজম করবেন আমরা তা কীভাবে হজম করব! কাজেই 'শত হস্তেন দূরেৎ' (শত হস্ত দূরে)।

মানুষ কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের কথা জানা গেল। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের বিষয়টা কী?

এই নিষিদ্ধ গাছের ফলের নাম 'গন্ধম'। বিবি হাওয়ার প্ররোচনায় আদম এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন।

সমস্যা হলো গন্ধম আরবি শব্দ না। ফারসি শব্দ। পবিত্র কোরআন শরিফে কোথাও এই ফলের নাম নেওয়া হয় নি। হাদিসেও নাম নেই। তাহলে আমাদের কাছে এই গন্ধম কোত্থেকে এল? বাউলরা গান পর্যন্ত লিখলেন, 'একটি গন্ধমের লাগিয়া...।'

যিশুখ্রিষ্টের জন্মের চার শ' বছর আগে নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্পর্কে লিখলেন ইনক। তাঁর বইয়ে (*The sedipigraphic book of Inok*) বলা হয়েছে, এই গাছ দেখতে অবিকল তেঁতুলগাছের মতো। ফল আঙুরের মতো, তবে সুগন্ধযুক্ত।

গ্রিক মিথ বলছে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল হলো বেদানা।

রাব্বি নেসেমিয়া বলছেন, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল হলো ডুমুর।

ধর্মগ্রন্থ তালমুদ বলছে, নিষিদ্ধ ফল আঙুর।

প্রাচীন চিত্রকলায় আদম, ইভ এবং সর্পের সঙ্গে যে ফলটি দেখা যায় তার নাম আপেল।

এখন তাহলে মীমাংসাটা কী?

পাদটীকা

বিষাক্ত ফলের তালিকায় আছে আপেল! আপেলের বিচিতে থাকে বিষ। বিষের নাম সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইড। একটা বিচি খেলে তেমন কিছু হয় না। একের অধিক খেলে...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বিনের বাদশাহ্

জ্বিনের বাদশাহ্র সঙ্গে বিশেষ সখ্য আছে এমন একজন আমার সামনে বসে আছে। তার নাম 'ছালাম'। বাড়ি ফরিদপুর। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। মাথায় বাবরি চুল, মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে যাত্রার সখীদের মতো টেনে টেনে সুরমা দেওয়া। পরনে নীল লুঙ্গির উপর ধবধবে সাদা হাফহাতা গেঞ্জি। মানুষটার দিকে তাকালে সাদা গেঞ্জি প্রথমে চোখে পড়ে। মনে হয় মূর্তিমান সার্ফ এক্সেলের বিজ্ঞাপন।

আমি তখন সুখাইয়ের জমিদার বাড়ির ঘাটে বসা। 'ঘেঁটুপুত্র কমলা'র শুটিং করতে গিয়েছি। ছাদের রেলিংয়ে শুটিং হবে। ঘেঁটুপুত্র রেলিংয়ের উপর দিয়ে হাঁটবে।

ক্যামেরাম্যান মাহফুজ বলল, ক্রেন বসাতে দেরি হবে। স্যার, আপনি রেস্ট নিন। চা-সিগারেট খান। সব রেডি হলে আপনাকে ডাকব।

আমি ঘাটে বসে সময় কাটানোর জন্যে বই পড়ছি। বইয়ের নাম *Unnecessary Informations* (অপ্রয়োজনীয় তথ্য)। বিচিত্র সব তথ্য পড়ে যথেষ্টই আনন্দ পাচ্ছি। স্পেনের রানী ইসাবেলা সমগ্র জীবনে দু'বার মাত্র স্নান করেছেন, এই তথ্য যখন পড়ছি তখনই জ্বিনের বাদশাহ্র উপদ্রব। এই উপদ্রব থেকে রক্ষার উপায় হচ্ছে ধমক দিয়ে ছালাম নামধারীকে বিদায় করা। আমি তা না করে মুখের উপর বই ধরে থাকলাম। আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ছালাম নিজ থেকেই বিদায় হবে। দিনের শুরুতেই ধমকা-ধমকি করতে ইচ্ছা করছে না।

স্যারের কাছে আমি একটা আবদার নিয়া আসছি।

আমি বই থেকে মুখ সরালাম না। বই থেকে অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলাম। যুক্তরাষ্ট্রের ডাকটিকিটে প্রথম যে মহিলার ছবি ছাপা হয় তিনি স্পেনের রানী ইসাবেলা।

স্যার, আপনার নিকট একটি আবদার করেছিলাম।

বই থেকে চোখ না সরিয়েই আমি বললাম, কী আবদার ?

জ্বিনের বাদশাহ্ ফিল্মের শুটিং দেখার খায়েস করেছেন। যদি অনুমতি দেন।

এই কথা শোনার পর আর বইয়ে চোখ রাখা যায় না। আমি বই নামিয়ে রেখে বললাম, কে ছবির শুটিং দেখতে চায় ?

জ্বিনের বাদশাহ্। উনার নাম হেকমত শাহ্।

ও আচ্ছা।

অনুমতি ছাড়াই উনি শুটিং দেখতে পারেন। তাকে তো কেউ দেখবে না। উনি অদৃশ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে অনুমতি চাচ্ছেন কেন ?

জ্বিনের বাদশাহ্ বলে কথা। উনার একটা ইজ্জত আছে।

আমি বললাম, অনুমতি দিলাম। তাকে শুটিং দেখতে বলো।

তাঁর জন্যে একটা চেয়ারের ব্যবস্থা কি করা যায় স্যার ? চেয়ারে বসে শুটিং দেখলেন।

আমি মুখের সামনে বই ধরলাম। একে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি। আমি পড়ছি—স্থলভূমিতে এক মাইল হলো ৫২৮০ ফুট, আর পানিতে এক নটিকেল মাইলের দৈর্ঘ্য ৬০৮০ ফুট। এই তথ্যটাকে তেমন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে না।

স্যার, জ্বিনের বাদশাহ্ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। উনি বলেছেন, আসসালামু আলায়কুম। উনার সালামের জবাব যদি দেন উনি খুশি হবেন।

সালামের জবাব দেওয়ার আগেই প্রডাকশন ম্যানেজার কামরুল এসে জানাল শট রেডি হয়েছে। আমি উঠে গেলাম। জ্বিনের বাদশাহ্ হেকমত শাহ্‌কে ওয়ালাইকুম সালাম বলা হলো না।

শটটা জটিল ও বিপজ্জনক। ঘেঁটুপুত্র কমলা তিনতলার পিচ্ছিল রেলিং ধরে হাঁটবে। যে-কোনো সময় স্লিপ কেটে পড়ে যেতে পারে। নিচে ত্রিপল ধরে লোকজন আছে। পড়ে গেলে আটকাবে। জটিল শটের সময় তুচ্ছ সব ঝামেলা দেখা যায়, যার জন্যে প্রস্তুতি থাকে না। এখানেও তা-ই হলো। কমলা হাঁটা শুরু করতেই একটা দাঁড়কাক উড়ে এল। কাকটার ভাবভঙ্গি ভালো না। তার চেষ্টা কমলার মাথায় ঠোঁকর দেওয়া।

'কাট' বলে শট এনজি করা হলো। কাক দূর করার চেষ্টা চলতে লাগল। কেউ ঢিল ছুড়ছে, কেউ ক্যানেস্তারা পিটাচ্ছে। কাক ভয় পেয়ে উড়ে চলে গেল, কিন্তু শট শুরু হতেই সে উড়ে এল। নিশ্চয়ই আশপাশের কোনো গাছে তার বাসা। কমলা রেলিং ধরে এগুতেই সে ভাবে তার বাসার ডিম চুরি করতে কেউ আসছে। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত অনেক ঝামেলা করে এলোমেলোভাবে শট নেওয়া হলো। আমি লাঞ্চব্রেক দিলাম।

সবাই একসঙ্গে লাইন ধরে খেতে বসেছি। চোখে পড়ল জ্বিনের বাদশাহ্‌র বন্ধু ছামাদ আয়োজন করে খাচ্ছে। আমি প্রডাকশন ম্যানেজারকে বললাম, ওই লোক ইউনিটের কেউ ?

ম্যানেজার বলল, জি-না স্যার। সে বলেছে আপনি নাকি অর্ডার দিয়েছেন যতদিন শুটিং চলবে সে তিন বেলা খাবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

ম্যানেজার চিন্তিত গলায় বলল, আপনি কি এমন কথা বলেন নাই ? কী সর্বনাশ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, সর্বনাশের কিছু নাই। খাক তিন বেলা। শুধু বলে দাও—আমাকে যেন বিরক্ত না করে, আমার ধারে কাছে যেন না আসে।

ম্যানেজার বলল, স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। আপনার দশ গজের ভেতর গেলে তার ঠ্যাং ভেঙে দিব।

সোনামুখি সুঁই (সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুঁই) হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়ার কথা শোনা যায়। ছামাদের ব্যাপারেও তা-ই দেখলাম। সে অল্প সময়ের ভেতরই প্রডাকশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে গেল। সে ভিড় সামলাচ্ছে, শিল্পীদের মাথার উপর ছাতি ধরছে, খাবার পরিবেশন করছে। একদিন দেখলাম প্রডাকশন ম্যানেজারের গায়ে সাবান ডলে গোসল করিয়ে দিচ্ছে।

সিনেমার শুটিং-এ সিগারেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কে ফ্রি সিগারেটের প্যাকেট পাবে কে পাবে না তা নির্ধারিত। এই নিয়ে হইচই ঝুট-ঝামেলা হয়। কেউ কেউ রেশনিং মানতে চায় না। ফ্রি সিগারেটের জন্যে দেনদরবার। একদিন দেখলাম এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব ছামাদের হাতে চলে গেছে। সে মেকাপম্যানের সঙ্গে সিগারেট নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে।

আমারে আপনে যদি চাইনিজ কুড়াল দিয়া কোপ দেন তারপরেও সিগারেট মিলবে না। ইউনিটের নিয়মে আমারে চলতে হবে। টাকা দেন, আপনের সিগারেট নিয়ে আসব।

আমি ছামাদের উত্থান নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ফিল্ম ইউনিটে উত্থান ও পতন স্বাভাবিক ঘটনা। ছামাদ যে জ্বিনের গল্প করে আমাকে বিরক্ত করছে না, এতেই আমি খুশি।

'ঘেঁটুপুত্র কমলা' ছবির আউটডোর শুটিং সন্ধ্যার পরপর শেষ হয়ে যেত। রাতের সব কাজ রাখা হয়েছিল সেটের জন্যে। দুর্গম হাওরে লাইট নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু দৈত্যাকৃতি জেনারেটর নিতে পারি নি। আমাদের সন্ধ্যার পর কিছুই করার থাকে না। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দরজা বন্ধ করে ঘুমান। এই বিষয়টি শুধুমাত্র ফিল্মের শুটিংয়ের বেলায় দেখা যায়। মনে হয় ৩৫ মি.মি. ক্যামেরার সামনে অভিনয় করা স্লিপিং ট্যাবলেট হিসেবে কাজ করে।

ক্রু মেম্বার আর প্রডাকশনের ছেলেমেয়েরা অবসরে গানবাজনা করে। তাদের সঙ্গে সবসময় হারমোনিয়াম ও তবলা থাকে।

এক সন্ধ্যায় দেখি গানবাজনার আসরে আমাদের ছালাম বাবরি চুল দুলিয়ে গান করছে—'কাজল ভোমরা রে কোনদিন আসিবে ফিরে কয়া যাও কয়া যাও।' আব্বাসউদ্দীনের বিখ্যাত গান।

ছালাম সুর খানিকটা এদিক-ওদিক করেছে, কিন্তু গাইছে চমৎকার। তার গলা খানিকটা মেয়েলি হলেও সুর আছে। স্ট্যান্ডিং নোট কাঁপছে না। গানের মূল শক্তি আবেগ। সেই আবেগেরও কোনো ঘাটতি দেখলাম না, বরং খানিকটা বাড়াবাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম। আজকাল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নানান ধরনের গানের প্রতিযোগিতা হয়—রাজমিস্ত্রিদের গান, রাজমিস্ত্রির জোগালিদের, ট্রাক ড্রাইভার, হেলপারদের গান, এক চোখ নষ্ট ভিক্ষুকদের গান। প্রতিযোগিতার অভাব নেই। ছালামের গান শুনে আমি নিশ্চিত যে, এই ধরনের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বা রানারআপ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আমি ছালামকে ডেকে পাঠালাম। আমাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো—

তোমার গানের গলা তো খুব সুন্দর!

জে স্যার। এই গান আমারে খাইছে। বিরাট বিপদে আছি।

কী রকম বিপদ ?

লম্বা হিস্টোরি। স্যার বলব ?

সারসংক্ষেপ করে বলো।

একদিন নিশিরাইতে মনটা উদাস হয়েছিল। গানে টান দিলাম। আব্দুল আলিম সাহেবের গান—'হলুদিয়া পাখি সোনারই বরণ পাখিটি ছাড়িল কে ?' এই সময় আমার মাথার উপরে দিয়া উইড়া যাইতেছিল জ্বিনের বাদশাহর পঞ্চম মেয়ে। নাম বিবি মোহতেরমা। সে আসমান থাইকা নামল। অপূর্ব রূপবতী মেয়েছেলের বেশ ধরল। লইজ্জার বিষয় কি জানেন স্যার, মেয়েছেলের বেশ ঠিকই ধরেছে, কিন্তু শইল্যে কাপড় নাই। আমি দুই হাতে চোখ ঢাইকা বললাম, কন্যা, তোমার পরিচয় ?

সে বলল, আমি জিনের বাদশাহর পঞ্চম কন্যা। আমার নাম বিবি মোহতেরমা। আপনের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আপনে আমার সঙ্গে কোহকাফ নগরে চলেন। সেখানে আমি পিতার অনুমতি নিয়া আপনারে শাদি করব। তখন আমি...

গল্পের এই পর্যায়ে ছালামকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি এখন যাও।

ছালাম আহত গলায় বলল, আর শুনবেন না ?

আমি বললাম, না।

বিরাট ইন্টারেস্টের জায়গাটা এখনো বলি নাই।

বলতে হবে না, তুমি বিদায় হও।

ছালাম বিমর্ষমুখে চলে গেল। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে ভাবছি, এই ধরনের গল্প সে কেন বানাচ্ছে ?

দু'টা কারণ হতে পারে। প্রথম কারণ, অন্যের কাছে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করা। জ্বিনের বাদশাহর সঙ্গে যার মেলামেশা সে গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই।

দ্বিতীয় কারণটা মানসিক। এক ধরনের ডিলিউশনের শিকার হয়ে কিছু মানুষ এই ধরনের কাণ্ড করে। সমাজে ডিলিউশনগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কম না। 'জনগণ তার জন্যে পাগল'—এই ডিলিউশনে অনেক রাজনীতিবিদ ভোগেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এক বন্ধু ভাবেন, যে-কোনো মেয়ের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সেই মেয়ে আধাপাগল হয়ে ছুটে আসবে। এমনই তার চোখের সম্মোহনী শক্তি। প্রবল সম্মোহনী শক্তির কারণে ভীত হয়েই তিনি সচরাচর কোনো তরুণীর চোখের দিকে তাকান না। চোখে চোখ পড়লে চট করে চোখ নামিয়ে নেন। এটাও ডিলিউশন।

বাদ থাকুক তত্ত্বকথা, মূল গল্পে আসি।

শুক্রবার। জুমার নামাজের জন্যে দু'ঘণ্টা শুটিং-বিরতি। আমি গাছের ছায়ায় চেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসে আছি। মন আনন্দে পরিপূর্ণ। খবর পেয়েছি শাওন ঢাকা থেকে ভোরবেলা তার দুই পুত্রকে নিয়ে রওনা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার উপস্থিত হওয়ার কথা। দুইপুত্রকে নিয়ে অনেক দিন পর চটকা চটকি করা যাবে।

হঠাৎ বিরাট হইচই।

আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। ফিল্ম ইউনিটে অতি তুচ্ছ ঘটনা লঙ্কাকাণ্ডে রূপ নেয়। মাথা ফাটে, রক্তারক্তি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব সমাধান। যে যার কাজ করছে। সবাইকে আনন্দিত মনে হয়। কারণ—দুর্ঘটনা ঘটেছে, রক্তপাত হয়েছে, ছবি হিট হবে।

হইচইয়ের কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দেখি, ছবি হিট করার ব্যবস্থা ভালোমতোই সম্পন্ন। ছামাদ মেঝেতে পড়ে আছে। তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। সে কোনো সাড়াশব্দ করছে না। আমি আঁতকে উঠে বললাম, মারা গেছে নাকি?

ছালাম কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, জিন্দা আছি স্যার।

হয়েছে কী?

মোবাইল ফোন চুরি করেছি, এইজন্যে মাইর দিয়েছে।

তুমি চুরি করেছ?

জি স্যার।

ঘটনা জানলাম—আমাদের এক অভিনেতার ব্যাগ রাখতে দেওয়া হয়েছিল তার কাছে। ব্যাগ, মানিব্যাগ, সিগারেটের প্যাকেট এবং আইফোন নামের দামি মোবাইল। সবই আছে, শুধু আইফোন নেই।

আমি ছালামকে বললাম, তুমি স্বীকার করেছ ফোন চুরি করেছ, ফেরত দিচ্ছ না কেন?

একটু অসুবিধা আছে।

বলো কী অসুবিধা?

সবার সামনে বলা যাবে না। তয় আপনারে বলব।

লোকজন সরালাম। ছালাম কষ্টে উঠে বসল। গলা নামিয়ে বলল, বিবি মোহতেরমা মোবাইলটা নিয়ে চলে গেছে। জিনিসটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে। জ্বিনের বাদশাহ্‌র আদরের মেয়ে, সে একটা জিনিস চাইলে তো না করতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে বলো ফেরত দিতে।

সে তো স্যার আশপাশে নাই। যখন আসবে তখন ফেরত দিতে বলব।

আমি বললাম, জ্বিন মেয়ে মোবাইল নিয়ে গেছে, এ ধরনের হাস্যকর কথা আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি করছি না। তুমি আইফোনটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছ, বের করে দাও।

স্যার, আমার কথা বিশ্বাস করেন—সে চেয়েছে বলে দিয়েছি। জ্বিনদের কাছে যন্ত্রপাতি নাই, যে কারণে যন্ত্রপাতির দিকে তাদের নজর। আমার একটা টর্চলাইট ছিল, নিয়া গেছে। ব্যাটারি শেষ হলে আমার কাছে ব্যাটারি নিতে আসে। ব্যাটারি কিনতে কিনতে আমি পথের ফকির হয়েছি।

এই উন্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো সময়ের অপচয়। আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। প্রডাকশন ম্যানেজারকে বললাম, মারধর যেন করা না হয়।

প্রডাকশন ম্যানেজার বলল, এর বিষয়টা আপনি মাথা থেকে অফ করে দেন। আমি ব্যবস্থা নিতেছি। মারধর করা হবে না, সে আপসে জিনিস কোথায় লুকায়েছে বলে দিবে।

কী ব্যবস্থা নিচ্ছ?

একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখব। খানা পানি দিব না। আগে মোবাইল বাইর করবে, তারপর রিলিজ।

শুটিং শেষ হলো সন্ধ্যায়। ছালামের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে একটা ঘরে তাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি বললাম, তাকে তো তালাবন্ধ করেই রেখেছ, আবার দড়ি দিয়ে বাঁধার দরকার কী?

প্রডাকশন ম্যানেজার কামরুল বলল, ভয় খাবে, এইজন্যে দড়ি দিয়ে বেঁধেছি।

ছালামকে দেখে মনে হলো না সে 'ভয় খাচ্ছে'। নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, জ্বিনের বাদশাহর কাছে খবর চলে গেছে, উনি আমারে রিলিজ করে দেবেন।

কামরুল বলল, জ্বিনের বাদশাহ তোর '...' ঢুকায়ে দিব। (পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, শরীরের কোন পথে জ্বিনের বাদশাহ ঢোকানো হবে।)

আমি কামরুলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, ভয় দেখাতে চাচ্ছ দেখাও, কিন্তু সকালবেলা অবশ্যই ছেড়ে দিবে।

কামরুল বলল, সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।

সকালে নাশতা খেয়ে শুটিংস্পটে যাওয়ার জন্যে গাড়িতে উঠেছি। ড্রাইভার মেহেদি বলল, খবর পাইছেন স্যার? বদটা তালা ভাইঙা পালাইছে।

ছালামের কথা বলছ?

জি স্যার। সবাই বলাবলি করতেছে জ্বিন তালা ভাঙছে। আমরা জ্বিনের ঝামেলায় পড়লাম। কী ঘটে কে জানে!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জবাব দিলাম না। মেহেদির নাপিতের মতো স্বভাব। অকারণে কথা বলে। তার প্রতিভা ইউনিটের তুচ্ছ কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে পত্রিকাওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। তাকে এই মুহূর্তে না আটকালে পত্রিকায় খবর আসবে— 'ঘেঁটুপুত্র কমলার ইউনিটে জ্বিনের হামলা'।

আমি বললাম, মেহেদি শোনো! জ্বিন তালা ভাঙে নি। ছালামের কোনো বন্ধুই গোপনে এই কাজ করেছে। এই বিষয়ে আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না।

মেহেদি বলল, কামরুল ভাই বিরাট আতঙ্কের মধ্যে—জ্বিন তারে ধরবে। শুনেছি কামরুল ভাই ইউনিট ছাইড়া চলে যাবে।

চলে গেলে চলে যাবে। আমি বলেছি জ্বিনবিষয়ক আলোচনা বন্ধ। যে এই নিয়ে আলোচনা করবে তাকেও ইউনিট ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আমার হার্ডলাইনে যাওয়ার কারণ আছে। 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবির শুটিং করছি নুহাশপল্লীতে। শুটিংয়ের এক পর্যায়ে জ্বিনের উপদ্রপের কথা ছড়িয়ে পড়ল। নানান ধরনের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল।

তখন নুহাশপল্লী গজারি বনের জঙ্গল। আমি জঙ্গল পরিষ্কার করে পছন্দের গাছপালা লাগানো শুরু করি নি। ইলেকট্রিসিটি নেই, নিজস্ব জেনারেটরও নেই। শুটিংয়ের জন্যে ভাড়া করা জেনারেটরই ভরসা।

রাতে ঘরে ঘরে হারিকেন বা মোমবাতি জ্বালানো হয়। আঁধারি পরিবেশ। ভূত-প্রেত-জ্বিন উঁকি মারার অবস্থা। হঠাৎ করেই জ্বিনের গুজব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

প্রথম গুজব ছড়ালেন বিলকিস বানু নামের সত্তর বছর বয়সী এক অভিনেত্রী। শুরুর দিকের পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্রে তিনি সহনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। একসময় ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়লেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁর স্থান হলো এফডিসির গেটে। মোটামুটি ভিক্ষাবৃত্তি। আমি তাঁকে সাহায্য করার জন্যেই 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবিতে অভিনয় করার জন্যে ডাকলাম। তাঁর স্থান হলো মূল বাংলোয়, ছবির কলাকুশলীদের সঙ্গে। তখন নুহাশপল্লীতে তেমন কোনো স্থাপনা ছিল না। লিচুতলায় ছিল খুঁটির উপরে কাঠের ঘর। আমি থাকতাম লিচুতলা থেকে কিছুটা দূরে ছোট্ট কাঠের ঘরে। আরেকটা কাঠের ঘর ছিল প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (শাওন, জাহিদ হাসান, মাহফুজ) জন্যে।

বিলকিস বানু বলা শুরু করলেন, এই অঞ্চল জ্বিনে ভর্তি। এরা সবাই শান্ত প্রকৃতির জ্বিন। ফিল্ম ইউনিটের কারণে এদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এরা এখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। বিলকিস বানুর এই কথার পর অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় জ্বিন দেখা শুরু করল।

লাইটের লোকজন দলবেঁধে আমার কাছে এসে বলল, তারা অনেকগুলি মেয়ের একসঙ্গে খিলখিল হাসি শুনেছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেটরের লোকজন বলল, তারা বাথরুমে যেতে পারে না। বাথরুমের দরজা বন্ধ করলেই দরজায় ধাক্কা পড়তে থাকে। দরজা খুললে দেখা যায় কেউ নেই। জেনারেটর দলের প্রধান বলল, স্যার, আমরা এখানে কাজ করব না। জেনারেটর নিয়ে চলে যাব। আপনি অন্য জেনারেটর নিয়ে কাজ করুন।

আমি জেনারেটরের খোঁজে লোক লাগালাম। এক সন্ধ্যায় গাজীপুরের এক মাওলানা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি একটা বিশেষ খবর শুনে আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে সাবধান করতে এসেছি।

আমি বললাম, বলুন কী খবর শুনেছেন ?

রাত ঠিক বারোটার সময় আপনার ঘরের বান্দারায় নাকি চারটা কুকুর এসে শুয়ে থাকে ?

আমি বললাম, কুকুরের সঙ্গে তো ঘড়ি নেই যে ঘড়ি দেখে ঠিক বারোটার সময় আসবে। তবে কয়েকটা কুকুর রাতে বারান্দায় শুয়ে থাকে। ভোরবেলা চলে যায়।

এত ঘর থাকতে আপনার ঘরের সামনেই শুয়ে থাকে কেন ?

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, এটা তো কুকুরেরা ভালো বলতে পারবে। আমি পারব না।

তার পরেও আপনার ধারণাটা কী ?

আমি বললাম, কুকুর কেন আমার ঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকে এটা নিয়ে আমি গবেষণা করতে রাজি না।

মাওলানা বললেন, আপনি মনে হয় আমার কথায় রাগ করেছেন।

আমি বললাম, রাগ করি নাই, তবে বিরক্ত হয়েছি।

মাওলানা বললেন, আমি আর বিরক্ত করব না। রাতে কুকুরগুলা এলে ওদের দেখে চলে যাব।

এত রাতে যাবেন কীভাবে ?

আমি রিকশা নিয়ে এসেছি।

ঠিক আছে কুকুর দেখুন। শুটিংস্পটে মানুষজন নায়ক-নায়িকা দেখতে আসে, আপনি কুকুর দেখতে এসেছেন। খারাপ কী!

মাওলানার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের কারণে নিজেরই বেশ মন খারাপ হলো। আমি জ্বিনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছি বলে অন্যের উপর রাগ করার কোনো মানে হয় না। আমি মাওলানাকে আমার সঙ্গে ডিনার করতে বললাম। তিনি রাজি হলেন না। চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, আপনার বারান্দায় যে চারটা কুকুর রাতে এসে থাকে এরা কুকুর না। জ্বিন।

আমি বললাম, ও আচ্ছা। শুনে ভালো লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বিন একমাত্র প্রাণী যারা ইচ্ছামতো অন্যরূপ নিতে পারে। মানুষের রূপও নেয়। তবে সবচেয়ে পছন্দ করে সাপ ও কুকুরের রূপ নিতে। আমার ধারণা, আপনার ঘরে সাপের রূপ ধরেও কিছু জ্বিন আছে।

আমি বললাম, ভাই, আমার ঘরে কোনো সাপ নাই। সাপ আমি প্রচণ্ড ভয় পাই। ঘরের চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড দেওয়া। আমার খাটের নিচে মুখ খোলা কার্বলিক অ্যাসিডের শিশি। আমার বাথরুমেও কার্বলিক অ্যাসিড।

মাওলানা বললেন, আমি আপনার জন্যে একটা তাবিজ নিয়ে এসেছি। তাবিজটা কি রাখবেন?

আমি বললাম, না।

গলায় বা হাতে পরতে হবে না, আপনার ঘরে ঝুলিয়ে রাখলেই হবে।

আমি আবারও বললাম, না।

মাওলানা মন খারাপ করে চলে যাওয়ার পর মনে হলো তাবিজটা রেখে দিলেও হতো।

নুহাশপল্লীতে জ্বিনবিষয়ক বিশৃঙ্খলা চরমে উঠল। মেকাপম্যান তার অ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে গোপনে পালিয়ে গেল। জেনারেটরের লোকজন আমার কাছে বিদায় নিয়েই গেল। কোনো উপায় না দেখে 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবির শুটিং বন্ধ করে দিলাম। ঘোষণাটা দেওয়া হলো দুপুরে, সন্ধ্যার মধ্যে নুহাশপল্লী খালি। আমার সঙ্গে আছে দুজন কর্মচারী—নুরুল হক আর রফিক। তখন নুহাশপল্লীতে এই দুজন কর্মচারীই ছিল। আমি তাদের বললাম, সবাই চলে গেছে, তোমরা আছ কেন? তোমরাও চলে যাও।

রফিক বলল, আপনি যাবেন না?

আমি বললাম, না।

নুরুল হক বলল, স্যার, আপনি চলে যান। জ্বিনের উপদ্রব কমুক, তারপর খবর দিলে আসবেন।

আমি বললাম, আমি থাকব। জ্বিনের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। তোমরা চলে যেতে চাইলে চলে যাও। থাকলে থাকো।

রফিক চলে গেল। নুরুল হক আমার সঙ্গে ঝুলে রইল।

রাত ন'টা। নুরুল হক রান্না চড়িয়েছে। আমি লিচু বাগানের বেদিতে বসে আছি। হঠাৎ ঝড়ের মতো উঠল। লিচুগাছের পাতায় বাতাসের শব্দ হতে লাগল। লিচু বাগানে চারটা লিচুগাছ। আমি যে গাছের নিচে বসেছি তার পাতা ও ডাল কাঁপছে, অন্য গাছের পাতায় বাতাসের কাঁপন নেই। ভয়ে আমার কলিজায় কাঁপুনি শুরু হওয়ার কথা, কিছুই হলো না। মনে হয় চিন্তায়, দুঃখে, ক্ষোভে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন অদ্ভুত কথা বলি। লিচুতলাতেই জ্বিন নামক Entity-র সঙ্গে আমার কথা হয়। বিষয়টা আর কিছুই না, আমার হেলুসিনেশন। প্রবল শোক, মানসিক চাপ মানুষকে হেলুসিনেশনের জগতে নিয়ে যায়। সন্তানহারা পিতামাতা প্রবল মানসিক যাতনার সময় তার মৃত সন্তানকে জীবিত দেখেন। তার সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হন। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। আমার সঙ্গে জ্বিনের কথোপকথনের অংশ এই কারণেই লেখা অবান্তর মনে করছি।

মূল গল্পে ফিরে যাই। তালা ভেঙে জ্বিন ছালামকে নিয়ে গেছে, ঘটনাটি আমি এই কারণেই চাপা দিতে চাইলাম। 'শ্রাবণ মেঘের দিনে'র অবস্থা যেন আবার না হয়। শুটিং বন্ধ করে যেন অঞ্চলছাড়া হতে না হয়।

কঠিন বিধিনিষেধ কাজ করল। আউটডোর শুটিং ঝামেলা ছাড়াই শেষ করে ঢাকায় ফিরলাম। মাথায় গল্প ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রবল ডিলিউশনের শিকার এক মানুষের গল্প। যে ছালামের মতো জ্বিনকন্যার প্রেমে পড়ে এবং একসময় বিশ্বাস করে, জ্বিনকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তাদের একটি সন্তানও হয়। জ্বিনকন্যা একসময় সন্তান নিয়ে তার দেশে পালিয়ে যায়। মানুষটা তার সন্তানকে ফিরে পেতে ব্যস্ত। কী করে ফেরত পাবে তা সে জানে না। জ্বিনের দেশ কোথায়, কীভাবে সেখানে যাওয়া যায়, তাও তার কাছে অজানা।

জ্বিন-বিষয়ে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে বলেই এ নিয়ে গল্প ফাঁদা বিপজ্জনক। এমন কিছু লিখে ফেললাম যা ধর্মগ্রন্থ স্বীকার করে না তাহলে মহাবিপদ। বায়তুল মোকাররম থেকে শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মিছিল বের হতে পারে। রগকাটা স্কোয়াড বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পথে নামতে পারে। আমাকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করা হতে পারে। অতীতে আমাকে একবার মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছে। বার বার মুরতাদ হওয়া কোনো কাজের কথা না। যা লিখব তা ভালোমতো জেনে লিখতে হবে।

জ্বিন-বিষয়ে কেউ আমাকে তেমন কোনো তথ্য দিতে পারলেন না। যেসব তথ্য পেলাম সবই আমার জানা। যেমন, সন্ধ্যার পর জ্বিন মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিষ্টি খায়। তারা যে নগরে বাস করে তার নাম কোহকাফ নগর।—এইসব।

জ্বিন-বিষয়ে একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেল। আরবি ভাষায় লেখা এই জ্বিন আকরগ্রন্থের লেখক আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী (রহঃ)। ৭২৯ হিজরিতে লেখা বইটির নাম *আকাসুল মারজ্বানি ফী আহকামিল জ্বান*। এর উর্দু তর্জমা করেন পাকিস্তানের আলেম ইমাদুল্লাহ্ আনোয়ার। তিনি জ্বিন-বিশ্বকোষের নাম দেন *তারিখে জ্বিন্নতে ওয়া শায়াত্বীন*। এই বইটির একটি বাংলা তর্জমা আমার হাতে আছে। জ্বিন-বিষয়ক বইটিতে নবিজীর (দঃ) যেসব হাদিস ব্যবহার করা হয়েছে তার বেশিরভাগই আমার কাছে সহি হাদিস বলে মনে হয় নি। আলেমরা ভালো বলতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ে একদল আলেম বলছে বৈধ, একদল বলছে মকরুহ। আবার হানাফি মাজহাব বলছে অবৈধ, কারণ মানুষ ও জ্বিন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি।

জ্বিনের বেশ কিছু শ্রেণীবিভাগ আছে। একশ্রেণীর জ্বিন ইচ্ছামতো অন্য আকৃতি ধারণ করতে পারে।

একজন আলেম ইমাম সাআলাবী (রহঃ) কোরআন শরিফের নিচের আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, জ্বিন-মানুষের যৌনক্রিয়ায় সন্তান উৎপাদন সম্ভব।

আল্লাহ্ শয়তানকে বলছেন, 'তুই মানুষের সম্পদে ও সন্তানে শরিক হয়ে যা।'

জটিল ধর্মতত্ত্বে আমি গেলাম না। জ্বিন-মানুষের বিয়ের অংশটি নিয়ে গল্প লেখা শুরু করলাম। গল্পের নাম দিলাম—

অংক শিক্ষক হাদিসউদ্দিন

এবং

জ্বিনকন্যা বিবি মোহতেরমা

একজন লেখকের মাথায় গল্প কীভাবে আসে, পাঠক এখন নিশ্চয়ই খানিকটা ধারণা পাচ্ছেন। গল্পটির বীজ বোনা হয়েছিল নুহাশপল্লীতে 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবি তৈরির সময়। ছালাম সেই বীজে পানি দিল। বীজ থেকে অঙ্কুর বের করায় সাহায্য করল।

নুহাশপল্লীর একটি ঘটনা বলে এই লেখাটি শেষ করছি।

কাঠের বাড়ি ভেঙে নুহাশপল্লীতে পাকা দালান বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সবার আগে ভাঙা হলো আমার ঘর। ফলস সিলিং ভাঙতেই দুটা প্রকাণ্ড দাড়াস সাপ নেমে এল। কার্বলিক অ্যাসিড অগ্রাহ্য করে এরা দিব্যি বাস করছিল। আমি মশারি খাটাই না। কে জানে রাতে কতবার এরা আমার গায়ের উপর দিয়ে গিয়েছে।

মাওলানা সাহেবের কথায়, জ্বিনেরা সাপের রূপ ধরতে পছন্দ করে। তাহলে এই দুটি সাপ কি জ্বিন ? নুহাশপল্লীর লোকজন যখন সাপ দুটিকে পিটিয়ে মারল তখন কি তাদের উচিত ছিল না সর্পরূপ বাদ দিয়ে জ্বিনরূপে পালিয়ে যাওয়া ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেলগাড়ি ঝমাঝম

আমার শিশুবেলার প্রধান খেলা ছিল 'রেলগাড়ি খেলা'। বাসার কাঠের চেয়ারগুলিকে একটির পেছনে আরেকটি সাজাতাম। প্রথম চেয়ারটায় আমি গম্ভীর মুখে বসে ট্রেনের চাকার শব্দের অনুকরণে 'ঝিকঝিক ঝিকঝিক' করতাম।

শৈশবের অতি আনন্দময় সময় আলাদা করতে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলব ট্রেনে করে দাদার বাড়ি নানার বাড়ি যাওয়া। তখনকার ট্রেনের ইঞ্জিন ছিল কয়লার। জানালার পাশে বসে মাথা বের করলে অবধারিতভাবে চোখে পড়ত ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে আসা কয়লার টুকরা। কাজেই বড়দের প্রধান চেষ্টা ছিল শিশুদের জানালা দিয়ে মাথা বের করতে না দেওয়া। বড়দের সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমি শুধু যে মাথাই বের করতাম তা-না, শরীরের অর্ধেকটা জানালা দিয়ে বের করে রাখতাম। বড়মামার দায়িত্ব ছিল শক্ত করে আমার পা চেপে ধরে রাখা। চিরকুমারের মতো চিরবেকার বড়মামা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। আমাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতেন। অবসরে কবিতা ও জারিগান লিখতেন। কবিতাগুলিতে সুর বসিয়ে গান বানিয়ে শিশুমহলে দারুণ চাঞ্চল্য তৈরি করতেন।

ট্রেন-ভ্রমণে ফিরে যাই। শিশুবেলা কাটিয়ে আমি বালকবেলায় পড়লাম, রেলগাড়ির প্রতি আকর্ষণ মোটেই কমল না। বরং বাড়ল। আমার দুষ্টুমি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে ট্রেন-ভ্রমণে সবসময় আমাকে বসতে হতো বাবার পাশে। বাবা ছিলেন নীরব শিক্ষক। তিনি খুব আগ্রহ করে নানান তথ্য তাঁর বালকপুত্রের মাথায় ঢুকাতেন। যেমন, টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা কোন পাখির কী নাম। কেন রস্তায় ট্রেন চলতে পারে না, ট্রেনের চলার জন্যে চাকা লাগে।

এক ট্রেন-ভ্রমণে অদ্ভুত তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর বালকপুত্রকে চমকে দিলেন। তিনি বললেন, ট্রেন কত মাইল স্পিডে যাচ্ছে বলতে পারবি ?

আমি বললাম, না।

বাবা বললেন, খুব সোজা। টেলিগ্রাফের ২৭টা (সংখ্যায় ভুল হতে পারে, এখন মনে পড়ছে না) খাম্বার দূরত্ব হলো এক মাইল। তুই ঘড়ি হাতে নিয়ে দেখবি ২৭টা খাম্বা পার হয়ে যেতে কত সময় লাগে। সেখান থেকে বের করবি ট্রেন ঘণ্টায় কত মাইল বেগে যাচ্ছে।

এর পর থেকে আমার প্রধান কাজ হলো ঘড়ি হাতে বসে টেলিগ্রাফের খাম্বা গুনে ট্রেন কত মাইল স্পিডে যাচ্ছে তা বের করা। বালকবয়সে তিনি বিশাল এক বিস্ময় আমার ভেতর তৈরি করে আমাকে অভিভূত করলেন। আমি চেষ্টা করতে থাকলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জাতীয় কোনো বিস্ময় আমার পুত্র নিষাদের ভেতর তৈরি করতে পারি কি না। সমস্যা হচ্ছে, নিষাদের বয়স চার। এ বয়সের শিশুরা সবসময় বিস্ময়ের ভেতর থাকে। তাদের আলাদা করে বিস্মিত করা যায় না। হঠাৎ সুযোগ হয়ে গেল। আমি শ্রীলঙ্কায় ট্রেনে করে কলম্বোর দিকে যাচ্ছি। পুত্র নিষাদকে মনে হচ্ছে আমার শৈশবের ফটোকপি। ট্রেন-ভ্রমণের আনন্দে আমার মতোই উদ্বেলিত। আমি তাকে বললাম, বাবা, মন দিয়ে শোনো, ট্রেনের চাকা কী বলছে?

সে কিছুক্ষণ চাকার শব্দ শুনে বলল, জানি না তো কী বলছে?

আমি বললাম, ট্রেনের চাকা তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম বলছে। চাকা বলছে—নিষাদ-নিনিত, নিষাদ-নিনিত। নিষাদ-নিনিত, নিষাদ-নিনিত।

নিষাদ আবারও কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, বলছে তো!

পাঠকদের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, তারা জানেন যে-কোনো ছন্দময় শব্দ ট্রেনের চাকার সঙ্গে মিলবে। পুত্র নিষাদ ব্যাপারটা জানে না। সে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। সে বলল, বাবা, শ্রীলঙ্কার ট্রেন আমার নাম কীভাবে জানল?

আমি বললাম, সব ট্রেন তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম জানে। বাংলাদেশের ট্রেনও জানে।

বাংলাদেশে ফিরে সে আবার ট্রেনে চাপল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আনন্দধ্বনি। সে অবাক হয়ে বলল, ট্রেন বলছে নিষাদ-নিনিত, নিষাদ-নিনিত।

আচ্ছা, আমি কি ছোট একটি বাচ্চার সঙ্গে প্রতারণা করলাম না? এই শিশুটি একদিন বড় হয়ে জানবে, ট্রেন তার নামে গান করে না। সে কি তখন নিজেকে প্রতারিত মনে করবে না? পৃথিবীর সব দেশেই নানান ভাবে শিশুরা প্রতারিত হয়। পড়ে যাওয়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে রাখলে ইঁদুর সুন্দর দাঁত উপহার দেয়। তারা বিশ্বাস করে, সান্তাক্রজ এসে তাদের উপহার দিয়ে যায়। শিশুদের কাছে একসময় প্রতারণা ধরা পড়ে, তারা তখন (আমার ধারণা) বড়দের ক্ষমা করে দেয়।

আমরা বড়রাও প্রতারিত হই। প্রতারণা করেন রাজনীতিবিদরা। ইলেকশনের আগে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। বৈতরণী পার হওয়ার পর সবকিছুই ভুলে যান। বিস্মৃতি ব্যাধি হয়। এই ব্যাধি পাঁচ বছর থাকে। পাঁচ বছর পর রোগ সারে। আবার পূর্ণোদ্যমে পুরনো কথা বলতে থাকেন, আমরা আবারও প্রতারিত হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। আমরা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বেলতলায় যাই। বেলতলায় যেতে আমাদের বড় ভালো লাগে।

আচ্ছা এরকম হলে কেমন হয়—বাংলাদেশের সব মানুষ যদি ঠিক করে ভোট দিয়ে লাভ তো কিছু নেই, কাজেই এই নির্বাচনে আমরা কেউ ভোট দেব না। ইলেকশন হয়ে গেল, একটি ভোটও পড়ল না। তখন কী হবে? বাংলাদেশ কি সরকারবিহীন হয়ে পড়বে? আইন কী বলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাদটীকা

'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ' নামে আমি একটি স্কুল দিয়েছি। আমি কল্পনায় যে সুন্দর স্কুল দেখি এই স্কুলটি সেরকম। চার বছর ধরে স্কুলটা চলছে। পাশের হার শতভাগ। ড্রপআউট শূন্য। স্কুল দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন আসে, কিন্তু আমার এলাকার নির্বাচিত এমপি ও মহিলা এমপি কেউই দুই মিনিটের জন্যেও স্কুলে আসেন নি। আমি কিছুদিন আগে একদল লেখক, কবি, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীকে স্কুলে নিয়ে গেলাম। আমার এলাকার এমপিদের অনুরোধ করে চিঠি পাঠালাম তাঁরাও যেন আসেন। দুজনের কেউই এলেন না। এমপিদের নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতে হয়। বলতেই তো তারা সময় বের করতে পারেন না। টার্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখনো শুল্কমুক্ত গাড়ির ব্যবস্থা হলো না—এটা নিয়েও হয়তো ব্যস্ততা আছে।

'আমাদের সন্তানেরা থাকুক দুধে-ভাতে
আমাদের এমপিরা থাকুক ট্যাক্স-ফ্রি গাড়িতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বিন এবং পক্ষীকথা

নুহাশপল্লীর মাঠে বসে আছি। সময় সকাল দশটা। আমার সঙ্গে আছেন সিলেটের হ্যারল্ড রশীদ। তিনি একজন সংগীত পরিচালক, চিত্রকর এবং শখের জ্যোতির্বিদ। তিনি আমাকে বৃহস্পতির চাঁদ এবং শনিগ্রহের বলয় দেখাতে এসেছেন। নিজের টেলিস্কোপ নিয়ে এসেছেন। রাতে টেলিস্কোপ সেট হবে।

আমরা রাতের জন্যে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষার জায়গাটা সুন্দর। বেদী দেওয়া জাপানি বটগাছের নিচে বসেছি। আমাদের ঘিরে আছে ছয়টা চেরিগাছ। দু'টাতে ফুল ফুটেছে। নীল রঙের স্নিগ্ধ ফুল। চারদিকে নানান ধরনের পাখি ডাকছে। পাখির বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। সব পাখি চিনিও না। তাদের কিচিরমিচিরে ভোরবেলা জেগে উঠতে হয়। কাঁচা ঘুম ভাঙানোয় এদের ওপর খানিকটা রাগও করি। দু'টা কাঠঠোকরা পাখি আমাকে ভোরবেলায় অস্থির করে তোলে। এরা কাঠের ইলেকট্রিক পোলে গর্ত করে বাসা বানিয়েছে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এরা বাসা থেকে বের হয়। আমি যে ঘরে ঘুমাই তার কাঁচের জানালায় ঠোকর দেয়। মনে হয় জানালা ফুটো করতে চায় কিংবা আয়নায় নিজেকে দেখতে চায়। আরেকটি সম্ভবনা আছে—হয়তো এদের ঠোঁট কুট কুট করে। প্রচণ্ড শক্তিতে গ্লাসে ধাক্কা দিলে ঠোঁটে আরাম হয়।

পাখি দু'টির বজ্জাতির গল্প হ্যারল্ড রশীদের সঙ্গে করলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা আপনার নুহাশপল্লীতে এত পাখি, আপনি কি কখনো এখানে মৃত পাখি দেখেছেন?

আমি বললাম, পাখির বাসা থেকে পড়ে মরে গেছে এমন দেখেছি।

পূর্ণবয়স্ক মৃত পাখি?

আমি বললাম, না।

পূর্ণবয়স্ক মৃত পাখি যে কোথাও দেখা যায় না এই বিষয়টা আমি জানি। অনেক বছর আগে *Time* বা *Reader's Digest* পত্রিকায় একটা লেখা পড়েছিলাম "Where the dead birds go ?" সেখানেও মৃত পাখির বিষয়টাকে রহস্য বলা হয়েছে।

হ্যারল্ড রশীদ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, মৃত পাখিদের জ্বিন খেয়ে ফেলে, তাই আমারা মৃত পাখি দেখি না।

বলেন কী!

জ্বিনের খাবার হলো হাড়। পাখির হাড় তারা খেয়ে ফেলে।

হ্যারল্ড রশীদের কথা গসপেল মনে করার কোনো কারণ নেই।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সাদাত সেলিম সাহেবকে টেলিফোন করলাম। উনি একজন পক্ষীবিশারদ। বর্তমানে ঢাকা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। টেলিফোনে সহজে তাঁকে পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় না। আমার ভাগ্য ভালো, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, বিশাল নুহাশপল্লীকে পক্ষীর অভয়াশ্রম বলা যায়। আমি কেন এখানে মৃত পাখি দেখি না?

সাদাত সেলিম যে জবাব দিলেন তা হ্যারল্ড রশীদের জবাবের চেয়েও অদ্ভুত। তিনি বললেন, পাখিদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে। এরা কখন মারা যাবে তা বুঝতে পারে। বুঝতে পারা মাত্র দলবল ছেড়ে গহীন অরণ্যের দিকে যাত্রা করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে গহীন অরণ্যে তাদের মৃত্যু হয় বলেই আমরা লোকালয়ে মৃত পাখি দেখি না।

পক্ষী বিষয়ে সাদাত সেলিমের চেয়েও অনেক অদ্ভুত কথা একজন বলে গেছেন। তাঁর নাম বাবর। তিনি মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

বাবর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বাবরনামায়* লিখেছেন তাঁর সংগ্রহে একটি তোতা পাখি ছিল। তোতা পাখি কথা বলত। যা শুনত তা-ই বলত। তবে এই পাখির রক্ষক একদিন সম্রাটকে বলল, পাখিটা যে সব কথা শুনে শুনে বলে তা না। সে নিজ থেকেও কথা বলতে পারে। একদিন পাখিটা বলল, আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঢাকনাটা খুলে দাও।

আরেকদিনের কথা, সম্রাট দলবল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। সঙ্গে তোতা পাখিও আছে। পথে এক জায়গায় তোতা পাখির রক্ষক ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। সবাই চলে গেছে। তখন পাখিটা বলল, সবাই চলে গেছে, আমরা বসে আছি কেন? আমরা কেন যাচ্ছি না?

সম্রাট বাবর তাঁর জীবনীতে গালগল্প ফাঁদবেন বলে মনে হয় না। তিনি সেই সময়কার হিন্দুস্থানের নিখুঁত বর্ণনা তাঁর গ্রন্থে দিয়ে গেছেন। পাখির যে রক্ষক সম্রাটকে এই কথা বলেছে তার নাম আবুল কাসিম জালায়ের। সম্রাট লিখেছেন, এ আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

নানান ধরনের পাখি সম্পর্কে বাবর লিখে গেছেন। কয়েকটা উদাহরণ—

লুজা

মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এর গায়ে কয়েক রকমের রঙ। গলায় কবুতরের গলার মতো চকচকে রঙ আছে। এ পাখি পর্বতের চূড়ায় বাস করে।

ফিং

বিশাল পাখি। এদের এক একটি ডানা লম্বায় মানুষ সমান। এর মাথা ও গলায় কোনো লোম নেই। এর গলায় থলের মতো একটা কিছু ঝুলে। এর পিঠ কালো, বুক সাদা। এ পাখি মাঝে মাঝেই কাবুলে দেখা যায়। একবার আমাকে একটা ফিং পাখি ধরে এনে দিল। পাখিটা পোষ মানল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোকিল

> দৈর্ঘ্যে কাকের সমান, কিন্তু দেহ কাকের চেয়ে সরু। গান গায়। হিন্দুস্থানের বুলবুল। আমরা যেমন বুলবুল ভালোবাসি হিন্দুস্থানের লোকরা তেমনি কোকিল ভালোবাসে। ঘন গাছের বাগানে থাকে।

অদ্ভুত আরেক পাখির কথা আমি দাদাজানের কাছে শুনেছি। তিনি এই পাখির নাম বলেছেন 'মউত পাখি'। যখন কোনো বাড়িতে কারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন এই পাখি নাকি নিশিরাতে বাড়ির চালে এসে বসে অদ্ভুত গলায় ডাকতে থাকে। আমার সবচেয়ে ছোট ফুফুর মৃত্যুর দুই রাত আগে নাকি এমন একটা পাখি দাদাজানের বাড়ির টিনের চালে এসে বসে ডাকতে শুরু করে। আমার এই ফুপুর নাম মাহমুদা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। আমার মা সবসময় বলেন, এমন রূপবতী কিশোরী তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি।

পক্ষীবিশারদ সাদাত সেলিমের মতে পাখি নিজের মৃত্যুর অগ্রীম খবর পায়। এই ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীদের মৃত্যুর খবরও তাদের কাছে থাকার কথা।

পক্ষী প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি। এখন চলে যাই অন্য প্রসঙ্গে। অমবস্যার রাত। আকাশভর্তি তারা। হ্যারল্ড রশীদ তাঁর টেলিস্কোপ তারাদের দিকে তাক করেছেন।

আমরা প্রথম দেখলাম লুব্ধক নক্ষত্র। আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। ইংরেজি নাম সিরিয়াস। অতি প্রাচীন এক সভ্যতার নাম মায়া সভ্যতা। মায়ারা বলত তারা এসেছে লুব্ধক নক্ষত্রের পাশের একটি নক্ষত্র থেকে। লুব্ধক নক্ষত্রের পাশে কোনো নক্ষত্র এতদিন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এখন জোতির্বিদরা একটি নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন।

লুব্ধকের পরে আমরা দেখলাম একটা সুপারনোভা। তারপর দেখা হলো সপ্ত ভগিনি তারাগুচ্ছ (Seven sisters)। বৃহস্পতি ডুবে গিয়েছিল বলে বৃহস্পতি বা তার চাঁদ দেখা গেল না। শনিগ্রহের অবস্থান বের করতে হয় বৃহস্পতি গ্রহ থেকে। যেহেতু বৃহস্পতি নেই আমরা শনি দেখতে পারলাম না, তবে North star খুব খুঁটিয়ে দেখলাম।

নর্থ স্টারের বাংলা নাম ধ্রুবতারা। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান আছে— 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। সূর্য পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। আকাশের সমস্ত তারা পশ্চিমদিকে উঠে পূর্বদিকে অস্ত যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম নর্থ স্টার বা ধ্রুবতারা। এই তারা আকাশ স্থির হয়ে থাকে। নাবিকরা এই তারা দেখে দিক ঠিক করেন। আমাদের দেশের নৌকার মাঝিরাও এই তারা খুব ভালো করে চেনে।

তারা দেখা চলছে, হঠাৎ আমাদের আসরে চকচকে কালো রঙের এক কুকুর উপস্থিত হলো। হ্যারল্ড রশিদ বললেন, হুমায়ূন ভাই, এই কুকুরটা জ্বিন।

আমি বললাম, আপনার সমস্যা কী বলুন তো। সকালে বলেছেন মরা পাখি সব জ্বিন খেয়ে ফেলে। এখন বলেছেন কালো কুকুর জ্বিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যারল্ড রশিদ বললেন, আমি বই পড়ে বলছি।

কী বই ?

বইয়ের নাম *জ্বিন জাতির অদ্ভুত ইতিহাস*।

কে লিখেছেন ? প্রকাশক কে ?

এইসব মনে নাই।

বইটা কি আছে আপনার কাছে ?

না।

আমি ঢাকায় ফিরে এসেই নুহাশ চলচ্চিত্রের এক কর্মকর্তাকে বাংলাবাজারে পাঠালাম, সে যেভাবেই হোক *জ্বিন জাতির অদ্ভুত ইতিহাস* গ্রন্থ জোগাড় করবে।

দুপুরবেলা সে জানাল পাঁচটা ইতিহাস সে পেয়েছে। সবগুলি কিনবে কি-না।

আমি বললাম, সব কিনবে।

সে বিকেলে পাঁচটা বই নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি দেখলাম প্রতিটি বই হলো চীন জাতির ইতিহাস। সে চীনের ইতিহাসের সব বই কিনে নিয়ে চলে এসেছে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত *জ্বিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস* বইটি পাওয়া গেছে। মূল বই আরবি ভাষায়। লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান। আরেকটি বই পাওয়া গেছে *জ্বিন ও শয়তানের ইতিকথা*। এটিও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর (রহঃ) লেখা। বই দু'টি পড়ে জ্বিন জাতি সমন্ধে যা জেনেছি তার সারমর্ম—

AMARBOI.COM

জ্বিন শব্দের অর্থ

গুপ্ত, অদৃশ্য, লুকানো, আবৃত।

জ্বিন জাতির শ্রেণীবিভাগ

ক. সাধারণ জ্বিন।

খ. আমির : মানুষের সঙ্গে থাকে।

গ. আরওয়াহ : মানুষের সামনে আসে।

ঘ. শয়তান

ঙ. ইফরীব্ব (শয়তানের চেয়েও বিপদজনক। এদের দেখা পেলে আযান দিতে হবে।)

জ্বিন কিসের তৈরি ?

পবিত্র কোরান শরীফে বলা হয়েছে, "আমি আদমের আগে, জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি 'লু'-র আগুন দিয়ে।" (সুরাহ আল হিজর, আয়াত ২৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছেন, 'লু'-র আগুনের অর্থ খুবই সুন্দর আগুন। হযরত উমার বিন দীনার (রঃ) বলেছেন, জ্বিন জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে সূর্যের আগুন থেকে।

জ্বিনদের প্রকারভেদ

তিন শ্রেণীর জ্বিন আছে—

১. এরা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। খাদ্য গ্রহণ করে না। নিজেদের মধ্যে বিয়ে হয় না। সন্তান উৎপাদন করে না।

২. এরা মানুষের সংস্পর্শে আসে। খাদ্য গ্রহণ করে। বিয়ে করে। সন্তান উৎপাদন করে।

৩. সাদা রঙের সাপ এবং সম্পূর্ণ কালো কুকুরও জ্বিন।

জ্বিনদের খাদ্য

নবীজি (সঃ) বলেছেন, তোমাদের খাদ্য এমন সব হাড় যার প্রতি আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা-ই জ্বিনের খাদ্য। (তিরমিযী)

(আমরা শুনি জ্বিনরা মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। তার কোনো উল্লেখ পাই নি।)

জ্বিনদের সঙ্গে মানুষের বিয়ে

এই নিয়ে আলেমদের মতভেদ আছে। এক দল বলছেন, জ্বিন যেহেতু সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির, কাজেই তাদের সঙ্গে মানুষের বিয়ে অবৈধ।

আলেমদের আরেক দল বলছেন, পবিত্র কোরান শরিফে আল্লাহ্ শয়তানকে বলেছেন, 'তুই মানুষের সম্পদে ও সন্তানে শীরক হয়ে যা।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৬৪)

সন্তানে শারীক হতে হলে বিবাহ বাঞ্ছনীয়। কাজেই জ্বিনের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হতে পারে।

মানুষ এবং জ্বিনের যৌনক্রিয়ায় যেসব সন্তান জন্মায় তারাই হিজড়া। (হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)) এদের আরবি নাম খুন্নাস।

পাদটিকা

নিউজিল্যান্ডের এক বাড়িতে দু'টা ভূত ধরে বোতলবন্দি করা হয়েছে। একটি অল্পবয়সী দুষ্ট ভূত। অন্যটি শান্ত-ভদ্র ভূত। দু'টি ভূতই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিলামে তুলে বিক্রি করা হয়েছে।

সূত্র : *কালের কণ্ঠ*, ইন্টারনেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডায়েরি

পৃথিবীখ্যাত জাপানি পরিচালক কুরাশুয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন বড় পরিচালক হতে হলে কী লাগে ?

কুরাশুয়া জবাব দিলেন, একজন ভালো অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর লাগে।

এডগার এলেন পো-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন বড় লেখক হতে হলে কী লাগে ?

তিনি জবাব দিলেন, একটা বড় ডাস্টবিন লাগে। লেখা নামক যেসব আবর্জনা তৈরি হবে তা ফেলে দেওয়ার জন্যে।

লেখকরা ক্রমাগতই আবর্জনা তৈরি করেন। নিজেরা তা বুঝতে পারেন না। একজীবনে আমি কী পরিমাণ আবর্জনা তৈরি করেছি ভেবেই শঙ্কিত বোধ করছি। 'ফাউনটেনপেন' সিরিজের লেখাগুলি কি আবর্জনা না ? যখন যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি। চিন্তাভাবনার প্রয়োজন বোধ করছি না। লেখকের চিন্তাভাবনাহীন লেখা পাঠক যখন পড়েন তখন তারাও চিন্তাভাবনা করেন না। এই জাতীয় লেখার ভালো আশ্রয় ডাস্টবিন, পত্রিকার পাতা না। ঠিক করেছি কিছুদিন ফাউনটেনপেন বন্ধ থাকবে। ইমদাদুল হক মিলনকে বলব, ফাউনটেনপেনের কালি শেষ হয়ে গেছে।

কলমের কালি প্রসঙ্গে মনে পড়ল ছোটবেলায় ফাউনটেনপেনের কালি আমরা নিজেরা বানাতাম। কালির ট্যাবলেট পাওয়া যেত, এক আনা করে দাম। দোয়াতভর্তি পানি নিয়ে একটা ট্যাবলেট ফেলে দিলেই কালি। বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা এক দোয়াত পানিতে দু'টা ট্যাবলেট ফেলে কালি ঘন করত। কালো কালিতে কোনো এক অদ্ভুত আলো প্রতিফলনে সোনালি আভা বের হতো।

শৈশবে পড়াশোনা একেবারেই পছন্দ করতাম না। কিন্তু কালি আগ্রহের সঙ্গে বানাতাম। এই কালি ফাউনটেনপেনে ভরা হতো না। নিবের কলম দিয়ে লেখা হতো। অনেকের মতো আমার একটা অদ্ভুত দোয়াত ছিল। এই দোয়াত উল্টে গেলেও কালি পড়ত না। এই দোয়াতটাকে মনে হতো বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান। দোয়াত উল্টে গেছে কালি পড়ছে না—ঘটনা কীভাবে ঘটছে ভেবে শৈশবে অনেকবার মাথা গরম করেছি।

এখন কালি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প। একবার 'সুলেখা' নামের কালির বিজ্ঞাপন লিখে দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হাত পাতা হলো।

কবি লিখলেন,

> "সুলেখা কালি।
> এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত সুন্দর বিজ্ঞাপন না ?

পাঠক, বুঝতে পারছেন আমি কীভাবে যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি ? এই ধরনের লেখা আমি ব্যক্তিগত ডায়েরিতে কিছুদিন লিখতাম। ব্যক্তিগত ডায়েরি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত থাকে নি। *দৈনিক বাংলায়* ধারাবাহিকভাবে "আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত ডায়েরির ব্যাপারটা আমি বুঝি না। এগুলি কেন লেখা হয় ? যিনি লিখছেন তার পড়ার জন্যে ? লেখক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে ঠিক আছে। তার ডায়েরি প্রকাশিত হলে সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বোঝা যাবে। জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের অপ্রকাশিত ডায়েরি আমি *সাপ্তাহিক* পত্রিকায় নিয়মিত পড়ি। ২৩.১১.৫২ ও ২৪.১১ ৫২ তারিখে তার ডায়েরিতে কী লেখা ?

২৩.১১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত দোকানে। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৪.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

দোকানে কাটালাম সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১টা এবং বেলা আড়াইটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

সাত্তার খান কয়েকদিন আগে আমার কাছ থেকে টি আর ফরম নিয়েছিলেন যা তিনি তার কাছে রেখেছিলেন। তিনি এলেন সকাল দশটার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে দশটায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৭ তারিখে আবহাওয়া আগের মতোই ছিল না। তিনি লিখেছেন—

আবহাওয়া : আগের মতোই তবে ঠান্ডা একটু বেশি।

পাঠক হিসেবে ডায়েরি পড়ে আমি জানলাম, জনাব তাজউদ্দিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন। রাত দশটায় ঘুমুতে যান। আবহাওয়া থাকে আগের মতোই। তাঁর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ কেন দিনের পর দিন গুরুত্বহীন বিষয় লিখে গেছেন কে জানে! তাঁর ডায়েরির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিই পাঠকের কাছে আসা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরারিয়েলিস্টিক পেইনটিংয়ের গ্রান্ডমাস্টার সালভাদর দালিও ডায়েরি রাখতেন। তবে সবদিনের না। যেদিন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটত কিংবা নতুন কিছু ভাবতেন সেদিনই ডায়েরি লিখতেন। আমার কাছে যে কপি আছে সেটি ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত। (*Diary of a Genius*). কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে বাংলাদেশে (তখন পূর্বপাকিস্তান) জনাব তাজউদ্দিনও ডায়েরি লিখেছেন।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ তিনি লিখছেন—

> সারা জীবন ছবি এঁকে গেলে আমি সুখী হতাম না। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে Goethe-র মতো মানসিক পূর্ণতা আমার হয়েছে। Goethe প্রথমবার রোমে এসে যে ভঙ্গিতে বলেছেন— অবশেষে আমার জন্ম হচ্ছে। আমারও সেই অবস্থা।

এডগার এলেন পো মাঝে মধ্যে ডায়েরি লিখতেন। তাঁর ডায়েরির ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। মাঝে মাঝে সংকেতিক ভাষাও ব্যবহার করতেন। তাঁর সাংকেতিক লেখার পাঠোদ্ধার হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ডায়েরি লিখতেন ? তার লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'কে এক ধরনের ডায়েরি বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত গোছানো মানুষ। কাউকে চিঠি লিখলে তার কপি রাখতেন। এইসব চিঠিই ডায়েরির কাজ করত।

সতীনাথ ভাদুড়ির ডায়েরি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তিনি দিনলিপির পাশাপাশি গল্পের খসড়া লিখে গেছেন। গল্পের খসড়া এবং মূল গল্প পাশাপাশি পড়তে অদ্ভুত লাগে।

সতীনাথ ভাদুড়ির অনুকরণে কিছুদিন আমি ডায়েরিতে গল্পের খসড়া লেখার চেষ্টা করেছি এবং একদিন সকালের 'দুর ছাই' বলে ডায়েরি যথাস্থানে অর্থাৎ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি।

ডায়েরি না লিখলেও আমি নানান তথ্য কিন্তু লিখে রাখি। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একদিন বললেন, মুমূর্ষু বলতে আমরা মৃত্যুপথযাত্রী বুঝাই। অভিধান তা বলে না। অভিধানের অর্থ হচ্ছে—মরিবার ইচ্ছা। যার মরতে ইচ্ছা করে সে-ই 'মুমূর্ষু'। আমার তথ্যখাতায় এটা লেখা। লেখার নমুনা—

১০ এপ্রিল ২০১০

> জাদুকর জুয়েল আইচের জন্মদিনে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মুমূর্ষু শব্দের আভিধানিক অর্থ জানালেন।
>
> উনি বললেন, মুমূর্ষু শব্দের মানে আমরা জানি মরণাপন্ন। আসলে তা না। অভিধান বলছে—মুমূর্ষু হলো মরিবার ইচ্ছা। আমি জানি উনি ভুল করছেন। মুমূর্ষু অবশ্যই মরণাপন্ন। মুমূর্ষা হলো মরিবার ইচ্ছা। এই ভুল তথ্য আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া ঠিক না। গুরুত্বহীন মানুষের ভুলে তেমন কিছু যায় আসে না। গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ভুলে যায় আসে।

পাদটিকা

পটল সামান্য একটা সবজি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই সবজির দু'টা ব্যবহার আছে।

'পটলচেরা চোখ'

পটলকে লম্বালম্বিভাবে ফালা করলে টানা টানা চোখের মতো লাগে। সেই থেকে পটলচেরা চোখ।

'পটল তোলা'

পটল তোলা হলো মৃত্যু। তুচ্ছার্থে এর ব্যবহার। যেমন, হাবলু পটল তুলেছে।

পটল তোলার সঙ্গে মৃত্যুর কী সম্পর্ক আমি অনেকদিন জানতাম না। বাংলা ভাষার পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করেছি, তারাও কিছু জানাতে পারেন নি।

সম্প্রতি আমি এই বাগধারার উৎস জেনেছি। পাঠকদেরও জানাচ্ছি—"লিখে রাখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"

ফলবান পটলগাছের সবগুলি পটল তুলে নিলে গাছটি মারা যায় বলেই পটল তোলা মৃত্যু বুঝায়।*

কুইজ

পাদটিকার সঙ্গে এখন থেকে কুইজ যুক্ত হচ্ছে। আজকের কুইজ—

কোন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড থাকে তার মাথায়?

উত্তর : পিপীলিকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামধাম

মানুষের প্রথম পরিচয় তার নাম। দ্বিতীয় পরিচয় কি 'ধাম' ? নামধাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় বলেই এই জিজ্ঞাসা। আমি মনে করি না নামধাম মানুষের পরিচয়। চুরুলিয়াতে কাজী নজরুল নামের আরেকজন থাকলেই দুই নজরুলের এক পরিচয় হবে না। যদিও তাদের নামধাম এক।

নাম বিষয়ে আজকের লেখা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করি। সুরা বাকারায় আল্লাহপাক বলছেন, "আমি আদমকে প্রতিটি বস্তুর 'নাম' শিখিয়েছি।" এখানে 'নাম' নিশ্চয়ই প্রতীকী অর্থে এসেছে। নাম হলো বস্তুর property বা ধর্ম। আল্লাহপাকের অনুগ্রহে আল্লাহপাক যে জ্ঞান আদমকে দিলেন সব ফেরেশতা তা থেকে বঞ্চিত হলো।

আমরা মানব সন্তানরা বস্তুর নাম জানি। আগ্রহ নিয়ে নতুন নতুন নাম দেই। গ্যালাক্সির নাম দিলাম 'এনড্রমিডা'। মঙ্গলগ্রহের দুই চাঁদের একটির নাম দিলাম 'ডিমোস', আরেকটি 'ফিবোস'।

কিছু কিছু নাম আমরা আবার বাতিলও করে দেই। উদাহরণ 'মীরজাফর'। বাংলাদেশের কোনো বাবা-মা ছেলেমেয়ের নাম 'মীরজাফর' রাখবে না। 'মীরজাফর' এবং 'বিশ্বাসঘাতকতা' আজ সমার্থক। মীরজাফরের চেয়েও বড় বিশ্বাসঘাতক ছিল সিরাজের হত্যাকারী মিরন। তার প্রতি আমাদের তেমন রাগ নেই যেমন আছে মীরজাফরের প্রতি। মিরন নাম নিষিদ্ধ না, কিন্তু মীরজাফর নিষিদ্ধ। কেন ?

কুখ্যাতদের নামে বাবা-মা তাদের সন্তানদের নাম রাখেন না, আবার অতি বিখ্যাতদের নামেও রাখেন না। ইংল্যান্ডের বাবা-মা'রা তাদের সন্তানের নাম শেক্সপিয়র রাখেন না। আইনস্টাইন নাম রাখা হয় না। তবে আমেরিকার ফার্গো শহরে আমার এক অধ্যাপকের কুকুরের নাম ছিল আইনস্টাইন। তিনি আইনস্টাইনকে সম্মান দেখানোর জন্যে তার প্রিয় কুকুরের এই নাম রেখেছিলেন।

চিন্তায় এবং কর্মে আমেরিকানদের মতো জাতি দ্বিতীয়টি নেই। তাদের দু'টা নামের নমুনা দেই (এই দু'জন নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র)।

Mr. Long Frog (লম্বা ব্যাঙ)

Mr. Brown Fox (খয়েরি শিয়াল)

এখন আমার নিজের নামের জটিলতা বিষয়ে বলি। ১৯৭২ সাল। মা গিয়েছেন বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে। টাকা তুলতে পারলেন না। কারণ বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো এক অদ্ভুত কারণে মাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের নমিনি করে যান নি। তিনি নমিনি করে গেছেন তাঁর বড় ছেলেকে। কাজেই আমি গেলাম। আমিও টাকা তুলতে পারলাম না। কারণ বাবা তাঁর ছেলের নাম লিখেছেন শামসুর রহমান। আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমার বাবার অনেক অদ্ভুত স্বভাবের একটি হচ্ছে তিনি কিছুদিন পরপর ছেলেমেয়েদের নাম বদলাতেন। শুরুতে আমার নাম ছিল শামসুর রহমান। তিনি আমার নাম বদলে হুমায়ূন আহমেদ রেখেছেন, কিন্তু এই তথ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাগজপত্রে দিতে ভুলে গেছেন।

যাকে এত কথা বলা হলো তিনি মুখ গম্ভীর করে বললেন, আপনি প্রমাণ করুন যে শুরুতে আপনার নাম ছিল শামসুর রহমান।

আমি অতি দ্রুত তা প্রমাণ করলাম। ভদ্রলোকের হাতে একশ টাকা ধরিয়ে দিলাম। জীবনে প্রথম কাউকে ঘুষ দেওয়া।

আমাদের নবিজী (দঃ) সন্তানের নামকরণ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা সন্তানদের জন্যে সুন্দর সুন্দর নাম রাখবে। যেমন, আসিয়া নামটা রাখবে না। আসিয়া নামের অর্থ দুঃখিনী। দুঃখিনী নাম কেন রাখবে ?

আমার বড় চাচির নাম আসিয়া। দুঃখে দুঃখে তাঁর জীবন কেটেছে। শেষজীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা বাংলাদেশী মুসলমানরা ছেলেমেয়েদের ইসলামী নাম রাখতে আগ্রহী। আল্লাহর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম। যেমন, আব্দুল কাদের (আল্লাহর দাস)। গোলাম রসুল (রসুলের গোলাম)।

আল্লাহর নামের সঙ্গে মিলিয়ে কখনো কোনো মেয়ের নাম কেন রাখা হয় না ? আল্লাহপাক তো নারী-পুরুষের উর্ধ্বে, তারপরেও তাঁর নাম পুরুষবাচক কেন ভাবা হয় ? এই বিষয়ে জ্ঞানীরা কেউ কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

বাংলাদেশের শিক্ষিত এবং ২১ ফেব্রুয়ারির ভাবে উজ্জীবিতরা সন্তানদের জন্যে বাংলা নাম খোঁজেন, তবে ডাকনাম। ভালো নাম অবশ্যই ইসলামী।

বাংলা নাম নিয়ে আমি আছি বিপদে। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে, লেখকরা সুন্দর সুন্দর নাম জানেন। আমি কিন্তু জানি না। তাতে রক্ষা নেই, পরিচিতজনদের নাম দেওয়ার জন্যে আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। সিলেটের নাট্যকর্মী আরজুর ছেলে হয়েছে। নামের জন্যে দিনে চার-পাঁচবার টেলিফোন। আকিকা আটকে আছে।

আমি বললাম, নাম রাখো 'মানব'।

আরজু বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার সে তো মানবই, অন্য কিছু তো না। তাহলে মানব কেন রাখব ?

আমি বললাম, সেটাও একটা কথা। এক মাস সময় দাও নাম ভাবতে থাকি।

না স্যার, খাসি কেনা হয়ে গেছে। আজই নাম রাখা হবে। মানবই রাখা হবে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবিগঞ্জের আরেক অভিনেতার নাম সোহেল। তার প্রথম ছেলে হয়েছে। নামের জন্যে অস্থির। নাম আমাকেই রাখতে হবে। আমি বললাম, যেহেতু প্রথম সন্তান নাম রাখো প্রথম।

সোহেল বলল, নাম খুবই পছন্দ হয়েছে স্যার। অদ্ভুত।

এক বছর না ঘুরতেই আবারও তার এক ছেলে। তার নাম রাখলাম দ্বিতীয় এবং সোহেলকে বললাম, তৃতীয় ছেলেমেয়ে যাই হয় আমার কাছে নাম চাইবে না। সরাসরি নাম রাখবে তৃতীয়। পরেরজন চতুর্থ, তারপরের জন পঞ্চম... এইভাবে চলবে। ঠিক আছে?

জি স্যার ঠিক আছে।

সম্প্রতি ছেলের নামের জন্যে আমার কাছে এসেছে অভিনেতা মিজান। আমি বললাম, নাম রাখো 'লুব্ধক'।

মিজান মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, লুব্ধক জিনিসটা কী স্যার?

আমি বললাম, আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইংরেজিতে বলে Sirius.

মিজান-পুত্র এখন আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ যখন আর্কিটেক্টকে দিয়ে বাড়ি বানায় তখন বেশ আয়োজন করে বলে তার কী কী প্রয়োজন। যেমন, মাস্টার বেডরুমের সঙ্গে বারান্দা থাকতে হবে। ফ্যামিলি স্পেসে বই রাখার লাইব্রেরি হবে। সার্ভেন্টস টয়লেট আলাদা হবে। ইত্যাদি।

আমার কাছে যারা নাম চাইতে আসে, তারাও বেশ আয়োজন করেই তাদের দাবিগুলি তোলে। যেমন, এক মা তাঁর ছেলের নামের জন্যে এসেছে—

স্যার! ছেলের নামের প্রথম অক্ষর হবে আ। কারণ আমার নামের প্রথম অক্ষর 'আ', আতিয়া। শেষ অক্ষর হবে 'ল'। কারণ ছেলের বাবার নামের প্রথম অক্ষর 'ল', লতিফ। নামের অর্থ যদি নদী, আকাশ বা মেঘ হয় তাহলে খুব ভালো হয়। তারচেয়েও বড় কথা—নামটা হতে হবে আনকমন।

আমি বললাম, ছেলের নাম রাখো আড়িয়াল খাঁ। নদীর নামে নাম। আড়িয়াল খাঁ নামে আমাদের একটা নদী আছে, জানো নিশ্চয়ই?

ছেলের মা গম্ভীর মুখে বলল, আড়িয়াল খাঁ নাম রাখব?

হ্যাঁ। তোমার সব ইচ্ছা এই নামে পূরণ হচ্ছে। নদীর নামে নাম, আনকমন নাম, শুরু হয়েছে তোমার নামের আদ্যক্ষর 'আ' দিয়ে, শেষ হচ্ছে তোমার স্বামীর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে।

আমার স্বামীর বংশ খাঁ বংশ না।

তাতে কী? তোমার ছেলে খাঁ বংশের পত্তন করবে। তার থেকেই শুরু হবে খাঁ বংশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার, আপনাকে আমার ছেলের নাম রাখতে হবে না। ধন্যবাদ।

তোমাকেও ধন্যবাদ।

শুধু যে ছেলেমেয়েদের নাম তা-না, আমাকে অনেক স্থাপনার নামও রাখতে হয়েছে। কাকলী প্রকাশনীর মালিক সেলিম সাহেব উত্তরায় বিশাল চারতলা বাড়ি তুললেন। আমাকে নাম রাখতে হলো। নাম রাখলাম 'বৃষ্টি বিলাস'।

সেলিম সাহেব বাড়ির সামনে শ্বেতপাথরের ফলকে লিখলেন—এই বাড়ির নাম রেখেছেন...।

সময় প্রকাশনীর ফরিদ ময়মনসিংহে বাড়ি করবে। বাড়ির নাম আমি ছাড়া কে রাখবে ? নাম দিলাম 'ছায়াবীথি'।

নামকরণ চলছেই। এই নামকরণের একটা ভালো দিক হচ্ছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নামের পরিবর্তন হবে না।

পাদটিকা

ওল্ড ফুলস ক্লাবের সান্ধ্যসভায় কলকাতার এক ভাষাতত্ত্ববিদ উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই চেষ্টা করতে লাগলাম জ্ঞানী টাইপ কথা বলার। তেমন কোনো জ্ঞানী কথা খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম, আচ্ছা ভাই ? আম নামটা কীভাবে এল ? আমের বদলে জাম নাম আমরা কেন রাখলাম না ?

ভদ্রলোক বললেন, আমের নাম যদি জাম রাখা হতো তাহলে আপনি বলতেন, জাম রাখা হলো কেন ? কেন আম রাখা হলো না ?

আমি বললাম অত্যন্ত সত্যি কথা। বাংলা ভাষাভাষী বিশাল ভূখণ্ডে সবাই একসঙ্গে আম'কে আম ডাকা শুরু করল কেন ? মিটিং করে কি ঠিক করা হয়েছিল এই ফলটার নাম হবে আম ? আমি যতদূর জানি অতি প্রাচীনকালে মানব সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এক দলের সঙ্গে আরেক দলের যোগাযোগই ছিল না। অথচ সবাই একটা ফলের নাম রাখল 'আম'। এক হাজার মাইল লম্বা নদী ব্রহ্মপুত্র। সবাই তাকে ব্রহ্মপুত্রই ডাকছে। কে রেখেছিল আদি নাম ?

ভাষাতত্ত্ববিদ হকচকিয়ে গেলেন। আবোল-তাবোল কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর জন্যে ওই দিনের আসর ছিল শিক্ষাসফর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুইজ

আমাদের পাঁচ আঙুলের একটির নাম অনামিকা (রিং ফিঙ্গার) অর্থাৎ নামহীন। এই আঙুলটির নাম নেই কেন?

উত্তর : মহাদেব শিব তাঁর হাতের অনামিকা দিয়ে চারমাথা ব্রহ্মার একটা মাথা ঘাড় থেকে ফেলে দিয়েছিলেন।

এই কাজের পরপর মহাদেব অনুতাপে দগ্ধ হলেন। যে আঙুল দিয়ে তিনি এই কাজটি করেছেন সেই আঙুলকে তিনি অভিশাপ দিলেন। বললেন, আজ থেকে তুই নাম গ্রহণের যোগ্যতা হারালি। আজ থেকে তুই অনামিকা।

[উৎস : বাংলা শব্দের উৎস অভিধান। ফরহাদ খান।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব ?

মাদ্রাসার কিছু ছাত্র হইচই করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরকার নতজানু। সরকার জনতার চেতনারই ছায়া, কাজেই আমরাও নতজানু। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। হুংকার শুনছি—'সব ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হবে। শিখা অনির্বাণ নিভিয়ে দেওয়া হবে।'

সরকার দেরি করছে কেন ? শিখা অনির্বাণ নিভিয়ে অন্ধকারে প্রবেশ করলেই হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগের দরজা-জানালা এখনই সিল করে দেওয়া দরকার।

মাদ্রাসার যেসব বালক না বুঝেই হইচই করছে, তাদের কিছু ঘটনা বলতে চাচ্ছিলাম। তাদের না বলে আমি বর্তমান সরকারের সদস্যদের ঘটনাগুলো বলতে চাচ্ছি। তাঁরা কি শুনবেন ?

আমাদের মহানবী (সা.) কাবা শরিফের ৩৬০টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার কথাও তিনি বললেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল কাবার মাঝখানের একটি স্তম্ভে, যেখানে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা। নবীজি (সা.) সেখানে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'এই ছবিটা তোমরা নষ্ট কোরো না।' কাজটি তিনি করলেন সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অসীম মমতা থেকে। মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পরেও ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগে কাবা শরিফের মতো পবিত্র স্থানে এই ছবি ছিল, এতে কাবা শরিফের পবিত্রতা ও শালীনতা ক্ষুণ্ন হয় নি।

মহানবীর (সা.) প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাকের (আরব ইতিহাসবিদ, জন্ম : ৭০৪ খ্রিষ্টাব্দ, মদিনা; মৃত্যু: ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ, বাগদাদ) লেখা *দি লাইফ অব মোহাম্মদ* গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বললাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটি অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম (প্রকাশকাল ২০০৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫২)।

আমরা সবাই জানি, হজরত আয়েশা (রা.) নয় বছর বয়সে নবীজির (সা.) সহধর্মিণী হন। তিনি পুতুল নিয়ে খেলতেন। নবীজির তাতে কোনো আপত্তি ছিল না; বরং তিনিও মজা পেতেন এবং কৌতূহল প্রদর্শন করতেন। (মুহাম্মদ আলী আল-সাবুনী, রাওযাইউল বয়ন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৩)

৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওমর (রা.) জেরুজালেম জয় করেন। প্রাণীর ছবিসহ একটি ধূপদানি তাঁর হাতে আসে। তিনি সেটি মসজিদ-ই-নববিতে ব্যবহারের জন্যে আদেশ দেন। (আব্দুল বাছির, 'ইসলাম ও ভাস্কর্য শিল্প : বিরোধ ও সমন্বয়', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ পত্রিকা*, জুলাই ২০০৫ জুন ২০০৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারস্যের কবি শেখ সাদিকে কি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু আছে ? উনি হচ্ছেন সেই মানুষ, যার 'নাত' এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মিলাদে সবসময় পাঠ করে থাকেন।

বালাগাল উলা বি কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি...

মাদ্রাসার উত্তেজিত বালকেরা শুনলে হয়তো মন খারাপ করবে যে, শেখ সাদির মাজারের সামনেই তাঁর একটি মর্মর পাথরের ভাস্কর্য আছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা তা ভাঙে নি।

ইসলামের দুজন মহান সুফিসাধক, যাঁদের বাস ছিল পারস্যে (বর্তমান ইরান)—এঁদের একজনের নাম জালালুদ্দিন রুমি। অন্যজন ফরিদউদ্দিন আত্তার (নিশাপুর)। তাঁর মাজারের সামনেও তাঁর আবক্ষমূর্তি আছে। (*বরফ ও বিপ্লবের দেশে*, ড. আবদুস সবুর খান, সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

কঠিন ইসলামিক দেশের একটির নাম লিবিয়া। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বিশাল একটি মসজিদ আছে। মসজিদের সামনেই গ্রিকদের তৈরি একটি মূর্তি স্বমহিমায় শোভা পাচ্ছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা মূর্তিটি ভেঙে ফেলে নি।

আফগানিস্তানের তালেবানরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তি (যা ছিল বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ) ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা ভাঙছি সাঁইজির মূর্তি, যাঁর জীবনের সাধনাই ছিল—আল্লাহর অনুসন্ধান।

মাওলা বলে ডাক রসনা,
গেল দিন, ছাড় বিষয় বাসনা
যেদিন সাঁই হিসাব নিবে
আগুন পানি তুফান হবে
এই বিষয় তোর কোথায় রবে ?
একবার ভেবে দেখ না।

—লালন শাহ

দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমার দম বন্ধ লাগছে। কীভাবে প্রতিবাদ করব তা-ও বুঝতে পারছি না। একজন লেখকের দৌড় তাঁর লেখা পর্যন্ত। বিটিভিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের গাথা *জোছনা ও জননীর গল্প* প্রচার হচ্ছে। প্রতিবাদ হিসেবে এই গাথার প্রচার আমি বন্ধ করলাম। দেশ মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্যে এখনো তৈরি না।

বাংলাদেশে তো অনেক বড় বড় ইসলামি পণ্ডিত আছেন। তাঁরা কেন চুপ করে আছেন ? তাঁরা কেন পূজার মূর্তি এবং ভাস্কর্যের ব্যাপারটি সবাইকে বুঝিয়ে বলছেন না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মতো বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর সন্ধান এখনো পাওয়া যায় নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অতি তুচ্ছ এই প্রাণী নিজের মেধায় সৃষ্টিরহস্যের সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। তার পরিচয় সে রেখে যাচ্ছে কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায়। মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার এই প্রাণী তার দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মানুষের সৃষ্টির প্রতি সম্মান দেখানো মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতিই সম্মান দেখানো। কারণ সব সৃষ্টির মূলে তিনি বাস করেন।

এ দুর্ভাগা দেশ হতে, হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর,
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার।
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অপমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য মর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক ইউনূস

একটি দৈনিক পত্রিকা অধ্যাপক ইউনূসকে নিয়ে প্রথম পাতায় কার্টুন ছেপেছে। সেখানে তিনি হাসিমুখে রোগাভোগা একজন মানুষের পা চেপে শূন্যে ঝুলিয়েছেন। মানুষটার মুখ থেকে ডলার পড়ছে। অধ্যাপক ইউনূস বড় একটা পাত্রে ডলার সংগ্রহ করছেন। কার্টুন দেখে কেউ কেউ হয়তো আনন্দ পেয়েছেন। আমি হয়েছি ব্যথিত ও বিস্মিত। পৃথিবী-মান্য একজন মানুষকে এভাবে অপমান করা যায় না। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনি, 'মানীকে মান্য করিবে।'

বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তিও আছে—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তদ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

অধ্যাপক ইউনূসকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখাও হয় নি। এর প্রধান কারণ, অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের কাছ থেকে আমি নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পছন্দ করি। অনেক বছর আগে যখন অধ্যাপক ইউনূস নক্ষত্র হয়ে ওঠেন নি, আমি তাঁর কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে একটি বই উৎসর্গ করেছিলাম। সেই বইও আমি নিজের হাতে তাঁকে দিই নি। যত দূর মনে পড়ে, ইউনূস সাহেবের ছোটভাই সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের হাত দিয়ে পাঠিয়েছি। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ কেউ না বলে তাঁর সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ সখ্য আছে।

অধ্যাপক ইউনূস যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন আমি নাটকের একটি ছোট্ট দল নিয়ে কাঠমাণ্ডুর হোটেল এভারেস্টে থাকি। হোটেলের লবিতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ আমার ইউনিটের একজন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। সে বলছে, 'স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি।'

সে বলে নি, অধ্যাপক ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সে বলেছে, আমরা পেয়েছি। অধ্যাপক ইউনূসের এই অর্জন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্জন।

আমার মনে আছে, এই আনন্দ-সংবাদ শোনার পর আমি শুটিং বাতিল করে উৎসবের আয়োজন করি। সেই উৎসবের শিখা আমি বুকের ভেতর এখনো জ্বালিয়ে রেখেছি।

দেশের বাইরে যখন সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে যাই, তখন আগের মতো হীনম্মন্যতায় ভুগি না। কারণ, এই সবুজ পাসপোর্ট অধ্যাপক ইউনূসও ব্যবহার করেন, আমাদের ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা ব্যবহার করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছোট ছেলে নিষাদ 'সাহস' বলতে পারে না। 'হ' উচ্চারণে তার সমস্যা হয়। সে বলে 'সাগস'। আমিও তার মতো করে বলছি, অধ্যাপক ইউনূসকে ছোট করছে, কার এত বড় সাগস!

মানী লোকদের অসম্মান করে আমরা কী আনন্দ পাই ? ব্যাপারটার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমরা যাঁরা সাধারণ, তাঁরা বলতে পারি, এই দেখো, তুমি আমাদের মতোই সাধারণ।

একটি পত্রিকায় পড়লাম, গান্ধীজীকে নিয়ে বই লেখা হয়েছে। সেই বইয়ে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, গান্ধীজি ছিলেন সমকামী। হায় রে কপাল!

অধ্যাপক ইউনূসকে গান্ধীজির মতো গভীর গর্তে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হলেও আমি বিস্মিত হব না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময়ই তাঁর পেছনে থাকব এবং আশা করব, তাঁর মাথার ওপরের ঘন কালো মেঘ সরে সূর্যকিরণ ঝলমল করে উঠবে। আশা করা ছাড়া একজন লেখক আর কী-ইবা করতে পারেন!

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতালি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ

এখানে যে যোগাযোগমন্ত্রীর গল্প বলা হচ্ছে তিনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা এরশাদ আমলের মন্ত্রী নন। অন্য কোনো আমলের। তবে আনন্দের বিষয় সব আমলের জিনিস একই।—লেখক

যোগাযোগমন্ত্রী সালাহউদ্দিন খান ভুলু সাহেবের দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর অভ্যাস। মন্ত্রীর কঠিন দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি এই অভ্যাস বহাল রেখেছেন। একটু উনিশ-বিশ অবশ্য হচ্ছে; আগে ঘুমানোর সময় একজন গায়ের ঘামাচি মেরে দিত, এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায়ই ভাবেন, পলিটিক্যাল পিএসকে ঘামাচি মারতে বলবেন। সে আগ্রহ নিয়ে কাজটা করবে। একটাই ভয়, কোনো পত্রিকায় যদি নিউজ চলে যায়! পত্রিকাগুলো চলে গেছে দুষ্টদের দখলে। তারা সম্মানিত মন্ত্রীদের ওপর টেলিস্কোপ ফিট করে রেখেছে। আরাম করে ১০ মিনিট ঘুমানোর উপায়ও নেই।

সালাহউদ্দিন খান ভুলু দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন। মন-মেজাজ এখনো ধাতস্থ হয় নি। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন। এই সময় তাঁর পিএস (সরকারি) ঢুকলেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যারের ঘুম ভালো হয়েছে?

মন্ত্রী বললেন, আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি, দুপুরে আমি ঘুমাই না। চোখ বন্ধ করে একধরনের যোগব্যায়াম করি। 'শবাসন' এই ব্যায়ামের নাম। এতে টেনশন কমে।

পিএস বললেন, স্যার, সরি। আমি যোগব্যায়ামের ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। আপনার নাক ডাকার শব্দে বিভ্রান্ত হয়েছি।

আর বিভ্রান্ত হবেন না। নাক ডাকা না। দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা যোগব্যায়ামেরই অংশ। আমার নাকে পলিপ আছে বলে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাক ডাকার মতো শব্দ হয়। এখন ক্লিয়ার হয়েছে?

অবশ্যই, স্যার।

কোনো কাজে এসেছেন?

একটা রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মাইক্রোবাস ভেঙে গুঁড়া হয়ে গেছে। পাঁচজন মারা গেছে।

অ্যাকসিডেন্ট হলে মানুষ মারা যাবে, এটা নতুন কী? এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন?

অনেকেই আপনাকে দুষছে। রাস্তাঘাট ভাঙা, খানাখন্দে ভরা। এই কারণেই অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা কী মাস ?

ভাদ্র মাসের শুরু।

বৃষ্টি হচ্ছে না ?

রোজ বৃষ্টি হচ্ছে।

এই বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ঠিক থাকে ?

থাকে না, স্যার।

বাস্তবতা বুঝতে হবে। তুচ্ছ বিষয়ে মন্ত্রীকে দুষলে হবে না। বুঝেছেন ?

জি স্যার।

খরা মৌসুম আসুক, রাস্তাঘাট ঠিক হবে।

সাংবাদিকেরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চায়।

শুনতে চাইলেই আমি শোনাব না। আপনি বলে দিন, গতবারের সরকারের যোগাযোগ খাতে সীমাহীন দুর্নীতির কারণে রাস্তাঘাটের আজ এমন বেহাল দশা। একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিন।

জি স্যার। স্টেটমেন্টের ব্যবস্থা করছি। তবে আপনাকে একটু কষ্ট করে হাসপাতালে যেতে হবে।

কেন ?

মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় কিছু বিখ্যাত মানুষ মারা গেছে। যাঁরা আহত, তাঁদের দেখতে যাওয়া উচিত।

বিখ্যাত মানুষ কে মারা গেল ?

পিএস বিখ্যাত মানুষদের তালিকা বললেন।

মন্ত্রী বিরক্ত গলায় বললেন, এরা বিখ্যাত হলো কবে ? আমি তো নামও শুনি নাই। মিডিয়া এদের বিখ্যাত বানিয়েছে। সব মিডিয়ার কারসাজি। দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে মিডিয়া।

যথার্থ বলেছেন। তবে মিডিয়াকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।

হাসপাতালে গিয়ে কী বলব, ঠিক করে এনেছেন ? উল্টাপাল্টা কিছু বলে ফেলতে পারি। মুডি মানুষ তো, মুড়ের ওপর চলি।

পিএস বললেন, আমি দুই ধরনের বক্তব্য তৈরি করে এনেছি, যেটা আপনার পছন্দ। আপনি বলবেন, আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে, আমাদের কী করার আছে ?

মন্ত্রী বললেন, ভালো বক্তব্য। আল্লাহর ওপর কোনো কথা নেই। ধর্মভিত্তিক দল আমার এই বক্তব্য পছন্দ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা আপনি বলবেন, মাইক্রোবাসের চালকের অদক্ষতাই দুর্ঘটনার কারণ। সে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে দোষটা ওদের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে।

মন্ত্রী বললেন, এটাও খারাপ না। আমি বরং দুটো একত্র করে বলি। প্রথম বলি, মাইক্রোবাস চালকের ভুল। তারপর বলি, আল্লাহর মাল আল্লায় নিয়েছে। বুদ্ধিটা কেমন বের করেছি?

অসাধারণ। আপনার চিন্তাধারাই বৈপ্লবিক।

আমাদের এই মুডি মন্ত্রী নানা ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। মিডিয়া তাঁকে নিয়ে কিছু কাজকর্ম করল। মন্ত্রী যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখতে গেলেন, তখন বদগুলো তাঁর হাসিমুখের ছবি ছাপাল। রাস্তার বিশাল এক গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন—এ রকম ছবি। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তাঁর পদত্যাগ চেয়ে প্রতিবেদন ক্ষমা করা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে? মন্ত্রীরা হলেন কচ্ছপ। কচ্ছপের মতো কামড় দিয়ে তাঁরা মন্ত্রিত্ব ধরে রাখবেন। এটাই নিয়ম।

মন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সচিবের পরামর্শে কিছু জটিল পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন। একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। একটা ছোট্ট সমস্যা তাতে হলো; দেখা গেল, সবাই দুর্নীতিবাজ। বেগুনের বোঁটা অবস্থা। একজনকে শাস্তি দিলে বাকিরা খেপে যাবে। ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। কাজেই অনেক ঝামেলা করে একজন সৎ কর্মচারী খুঁজে তাকে বরখাস্ত করা হলো।

মন্ত্রী মহোদয় সব পত্রিকায় তাঁর একটি ছবি পাঠালেন। সেই ছবিতে তিনি কোদাল দিয়ে ভাঙা রাস্তার পাশে দাঁড়ানো। নিজে লেখা, 'মন্ত্রী মহোদয় নিজেই রাস্তা মেরামতে নেমে পড়েছেন।

কোনো পত্রিকা এই ছবি ছাপাল না, উল্টো এক বদ পত্রিকা এই ছবি নিয়ে কার্টুন বানিয়ে ছাপিয়ে ফেলল। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, রাক্ষস টাইপ চেহারার এক লোক খালি গায়ে খাকি হাফপ্যান্ট পরে বেলচা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ের এবং পায়ের বড় বড় লোম দেখা যাচ্ছে। কার্টুনের নিচে লেখা, 'যোগাযোগমন্ত্রী বলেছেন, আমি একাই ৩৫০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করব, ইনশাআল্লাহ।

মন্ত্রী তাঁর পিএসকে ডেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তিন কোটি টাকার একটা মানহানি মামলার ব্যবস্থা করুন। আমার ছবি বিকৃত করে ছেপে আমার মানহানি করেছে।

পিএস বললেন, বিকৃত করে তো ছাপে নাই, স্যার। কার্টুনে আপনাকে চেনা যায়।

আমাকে চেনা যায়?

জি স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার গাভর্তি লোম ?

লোমের পয়েন্টে মামলা করতে পারেন। তবে এখন নতুন ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। এরপর এরা নিউজ করে দেবে—কার্টুন ছবিতে মন্ত্রীর গায়ের লোম দেখানোয় এক কোটি টাকার মানহানির মামলা।

এক সকালবেলার কথা। মন্ত্রীর স্ত্রী সালমা বানু (বিশিষ্ট সমাজসেবী, পরিবেশ রক্ষাকর্মী, বিপন্ন হনুমান বাঁচাও আন্দোলনের সভানেত্রী) তাঁর স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমাকে না জানিয়ে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি কী করে এই কাজ করলে ?

মন্ত্রী বললেন, কী কাজ করলাম ?

পদত্যাগ করেছ, আমাকে না জানিয়ে।

পদত্যাগ করব কোন দুঃখে ?

পত্রিকায় নিউজ এসেছে। এই দেখো।

মন্ত্রী মহোদয় হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ'। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রী মহোদয় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।

হতভম্ব মন্ত্রী তাঁর পিএসকে টেলিফোন করলেন। অনেকবার রিং হলো, পিএস ধরলেন না। তিনিও নিউজ পড়েছেন। এখন যে মন্ত্রী নন তাঁর টেলিফোন কেন ধরবেন! আমজনতার টেলিফোন ধরার কিছু নেই।

মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পিএসকে টেলিফোন করলেন। পিএস তাঁর কোনো কথা না শুনেই বললেন, পদত্যাগ করে ভালো করেছেন। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আচ্ছা রাখি।

মন্ত্রী লাইন কেটে দেওয়ার পর অনেকবার চেষ্টা করলেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব টেলিফোন ধরলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লক্ষ করলেন, পত্রিকার এই বানোয়াট খবর সবাই বিশ্বাস করে বসে আছে। তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর সিগারেট ফুঁকছিল, তাঁকে দেখে সিগারেট ফেলে না দিয়ে শুধু পেছনে আড়াল করল।

মন্ত্রী মহোদয় প্রধানমন্ত্রীকে ধরার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টা দেখতে পেলে রবার্ট ব্রুসও লজ্জা পেত। একসময় চেষ্টা সফল হলো। প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন ধরলেন এবং বললেন, আপনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। মন্ত্রী না থেকেও জনগণের সেবা করা যায়। জনগণের সেবা করুন।

প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন রেখে দিলেন।

গল্পের মোরাল : মন্ত্রীদের বুকে এবং পায়ে লোম না-থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেত্রিশটা কামান নিয়ে বসে আছি

এবারের বিশ্বকাপের প্রথম খেলা বাংলাদেশের। এই খেলা কীভাবে দেখা হবে, তা নিয়ে *প্রথম আলোতে* একটা লেখা লিখেছিলাম। লেখা ব্যাকফায়ার করল। আমার সঙ্গে খেলা দেখার জন্যে পরিচিত-অপরিচিত লোকজন টেলিফোন করা শুরু করল। আমার সঙ্গে খেলা দেখতে হলে তো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার প্রয়োজন নেই। বাধ্য হয়ে ভেন্যু পাল্টালাম। নিজের বাসা ছেড়ে প্রকাশক-বন্ধু আলমগীর রহমানের বাসায় উপস্থিত হলাম। আমি, শাওন এবং পুত্র নিষাদ। তিনজনের গায়েই বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের জার্সি (জার্সি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে)।

আলমগীর রহমান বললেন, আপনারা তিনজন ? আর কেউ আসবে না তো ? আপনি তো দলবল ছাড়া চলেন না। আমি এত মানুষকে জায়গা দিতে পারব না।

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, আমরা তিনজনই।

আড়াইটা থেকে খেলা শুরু। দুপুর দুইটার মধ্যে আলমগীরের বসার ঘরে ভিড় জমে গেল। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই উপস্থিত। অপরিচিত কিছু লোকজনও আছে। সবার গায়েই বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের জার্সি। যারা জার্সি ছাড়া উপস্থিত হয়েছে, তারা ব্যাপার দেখে ছুটে গেল জার্সি কিনে আনতে। উৎসাহ-উত্তেজনায় সবাই ঝলমল করছে। কত আলোচনা, কত হিসাব-নিকাশ।

AMARBOI.COM

খেলা শুরু হওয়ার আগে 'বাংলাদেশ কেমন খেলবে'—এই বিষয়ে আলোচনা সভা। এই সভায় প্রত্যেকেই মতামত দেবে।

বন্ধু-আর্কিটেক্ট করিম বলল, 'গো-হারা হারবে। ইন্ডিয়ার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।' করিম একজন ক্রিকেটবোদ্ধা। ক্রিকেটবোদ্ধারা খেলোয়াড়দের চেয়েও অনেক ভালো ক্রিকেট বোঝে। ক্রিকেট কমেনটেটরদের চেয়েও এরা জ্ঞানী হয়ে থাকে।

অন্যপ্রকাশের কমল বলল, বাংলাদেশ হারবে, তবে হার্ড কনটেস্ট হবে। কমল ক্রিকেটবোদ্ধা প্লাস ক্রিকেট-রেকর্ড বিশেষজ্ঞ। কবে কোন খেলায় কে শূন্য রানে আউট হয়েছে, কমল বলে দেবে।

করিম বলল, কোনো কনটেস্টই হবে না। ইন্ডিয়া আগে ব্যাট করলে সাড়ে তিন শ' রান করবে। রানের হিমালয় পর্বত দেখে বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা চুপসে যাবে। দুই শ' রানে অলআউট।

আমি মন খারাপ করে দেখলাম, ক্রিকেট-বিজ্ঞজনেরা ইন্ডিয়া জিতবে বলে দিচ্ছেন, আর আমরা যারা ক্রিকেট কিছুই বুঝি না—যেমন আমি এবং আমার চার বছর বয়সী পুত্র—বলছি, বাংলাদেশ জিতবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র নিষাদের চেয়ে আমি তিন কাঠি ওপরে। আমি বললাম, বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে বাংলাধোলাই দিয়ে দেবে। দশ উইকেটে জিতবে। দশ উইকেটে জেতা মানে বাংলাধোলাই।

করিম বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি ক্রিকেট বোঝো না, কেন কমেন্ট করো ? প্লিজ, স্টপ।

টস হয়ে গেছে। বাংলাদেশ টসে জিতেও নিল ফিল্ডিং।

করিম মাথায় হাত দিয়ে বলল, সাকিব, তুই করলি কী! নিজের পায়ে নিজে ইলেকট্রিক করাত চালালি। ইন্ডিয়ার যেমন ব্যাটিং লাইন, ওরা করবে চার শ' রান। তোরা তো দেড় শ'ও করতে পারবি না।

আলমগীর রহমান বললেন, করিমের সঙ্গে আমি এক শ' ভাগ একমত। সাকিবের ভুল ডিসিশনের জন্যে আমরা হারলাম। পুলাপান ক্যাপ্টেন হয়ে গেলে যা হয়।

ওদের কথাবার্তা শুনে আমিও ওদের বাতাসে পাল তুললাম। ক্রিকেট অনেকটা মানসিক খেলা। বিশাল রানের পাহাড় দেখে যে-কোনো দলই ফুটা বেলুনের মতো চুপসে যাবে।

শাওন বলল ভিন্ন কথা। সে বলল, দলের ক্যাপ্টেন কোনো কিছু না ভেবেই ফিল্ডিং নেবেন, তা হয় না। নিশ্চয়ই এটি সিদ্ধান্ত তাঁর একার না। সবাই মিলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে। আমার মন বলছে, আমরা এবারও ভারতকে হারাব।

করিম বলল, ইন্ডিয়া হারলে আমি কান কেটে ফেলব। ক্রিকেট বোঝে না এমন কারও সঙ্গে খেলা দেখাই ঠিক না।

করিমকে কান কাটতে হলো না। ইন্ডিয়া জিতল।

আমি বললাম, ইন্ডিয়া যেমন জিতেছে , আমরাও জিতেছি। তিন শ' সত্তর রানের বিপরীতে দুই শ' তিরাশি রান মানেই বিজয়। বিশাল বিজয়!

ক্রিকেট খেলা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্যের সঙ্গে কেউ একমত হয় না। প্রথমবার সবাই একমত হলো। সবাই (অক্ষতকর্ণ করিমসহ) বলল, বাংলাদেশ হারে নি।

বাংলাদেশের বিজয় উপলক্ষে আমরা 'আমার সোনার বাংলা' গান গাইলাম। এগারোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আইসক্রিম কেক কাটা হলো।

এগারোটা মোমবাতি প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল, অনেক দিন ধরেই আমি 'এগারো' রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছি, পারছি না। ক্রিকেট এগারোজন কেন খেলে ? বারোজন না কেন বা দশজন না কেন ? ফুটবলেও এগারোজন, হকিতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো। এই এগারো কবে শুরু হলো, বা কেন শুরু হলো ? একইভাবে আমার মাথায় আরেকটি প্রশ্ন, আমরা তেত্রিশবার তোপধ্বনি করি কেন ? বত্রিশবার কেন করি না, বা চৌত্রিশবার কেন করি না ?

এখন বলি এগারো এবং তেত্রিশ এই লেখায় হঠাৎ কেন আনলাম। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে জিতবে এবং আমরা তেত্রিশবার তোপধ্বনি করব। এই ভেবেই তেত্রিশ তোপধ্বনি প্রসঙ্গ। হ্যালো, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা! আমরা কিন্তু তেত্রিশটা কামান নিয়ে বসে আছি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্তধন পাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটেছে। আমার হাতে বিশ্বকাপের দুটা টিকিট। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের খেলা মাঠে বসে দেখতে পারব। টিকিট দুটি এমপি হিসেবে শাওনের মা পেয়েছেন। তাঁর হাত থেকে ছিনতাই করে নিয়ে নিয়েছে তার ছোট দুই মেয়ে। শাওন দুই বোনের হাত থেকে গোপনে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। চোরের উপর বাটপারি একেই বলে।

আড়াইটার সময় খেলা শুরু হবে, আমরা সাড়ে বারোটার সময় ঘর থেকে বের হলাম। স্টেডিয়ামে ঢুকতে হলে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে, নিরাপত্তা চেকিং, আগেভাগে যাওয়াই ভালো।

স্টেডিয়ামে ঢোকার পথের রাস্তায় কোনো যানবাহন চলছে না। শত শত মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে। এদের হাতে টিকিট নেই। যেখানে খেলা হবে, তার আশপাশেই থাকতে পারার আনন্দেই তারা অভিভূত।

রাস্তায় প্রচুর তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল রঙতুলি নিয়ে ঘুরছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে বাংলাদেশ পতাকা আঁকছে। অতি উৎসাহীরা তাদের সারা মুখে হলুদ কালো আঁকিবুঁকিতে বাঘ সাজছে। শাওন তার গালে বাংলাদেশের পতাকা আঁকাল। আমি তাকে বললাম, আমার বাঘ সাজার শখ! তোমার কি আপত্তি আছে?

শাওন বলল, আপত্তি থাকবে কেন? তোমার যা সাজার ইচ্ছা সাজো।

শেষ মুহূর্তে বাঘ সাজার পরিকল্পনা বাদ দিলাম। বৃদ্ধ বাঘ সেজে মাঠে ঢোকার মানে হয় না। মাঠে ঢুকবে তরুণ বাঘ এবং বাঘিনীরা।

প্রথম পর্যায়ের নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে আমি ধরা খেলাম। পকেটের সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ ফেলে দিতে হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিরাপত্তা চেকিংয়ে শাওন ধরা খেল। তার হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেল ফেস পাউডারের কৌটা, মেকাপের কিছু জিনিসপত্র চিরুনি। সব ফেলে দিতে হবে। শাওন করুণমুখে দেনদরবার করছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। দেনদরবারে লাভ হলো না। সব ফেলে দিতে হলো।

স্টেডিয়ামে ঢুকে ধাক্কার মতো খেলাম। সব ছবির মতো সুন্দর। আমি বিদেশি কোনো স্টেডিয়াম দেখি নি, কাজেই তুলনা করতে পারছি না। তুলনা ছাড়াই বলছি, আমাদের এই স্টেডিয়াম দৃষ্টিনন্দন। বড় কোনো হোটেলের ঘরে ঢুকলে প্রথমেই বাথরুম দেখতে ইচ্ছা করে। আমি স্টেডিয়ামের বাথরুমে উঁকি দিলাম, সব ঝকঝক তকতক করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিকিটে নম্বর দেওয়া ছিল। নম্বর মিলিয়ে বসেছি। আমাদের সামনে (মাঠের ওপাশে) বিশাল টিভি স্ক্রিন। আমি অস্বস্তি নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। অস্বস্তির কারণ পুরো মাঠ একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আমার অভ্যাস টিভি স্ক্রিনে খেলা দেখা। সেখানে সবকিছুই খণ্ড খণ্ড করে দেখানো হয়। যখন বোলার বল হাতে ছুটে আসেন, তখন শুধু বোলারকে ধরা হয়। বল দেখানো হয় স্লোমোশনে। এখন সব খেলোয়াড়কে একসঙ্গে দেখব, ব্রেইন ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে পারছে না।

টস হয়ে গেছে। বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে। সারা মাঠে আনন্দের ঢেউ (আক্ষরিক অর্থেই ঢেউ) বয়ে গেল। একপ্রান্ত থেকে ঢেউ শুরু হয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে থামে। এর নাম 'মেক্সিকান ওয়েভ'।

দুই দলের খেলোয়াড়েরা সারি বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। সবার সামনে বাংলাদেশের একটি করে বালক বা বালিকা। সুন্দর দৃশ্য। শুরু হলো আয়ারল্যান্ড জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অনেক দর্শক দেখলাম উঠে দাঁড়ালেন। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আয়ারল্যান্ড আজ আমাদের শত্রু। শত্রুদের জাতীয় সঙ্গীতে কি উঠে দাঁড়ানো উচিত?

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সময় অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। দর্শকরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন। আমি লক্ষ করলাম, আমার চোখে পানি এসে গেছে।

খেলা শুরু হয়েছে। তামিমের দুর্দান্ত ঝড়ো ব্যাটিং। আমাদের পেছনে বসা কিছু তরুণের মন্তব্য শুনে মজা পাচ্ছি।

'তামিম, তক্তা বানায়ে দাও।'

'মুখ বরাবর বল মারো। বদগুলির মুখ ভোঁতা করে দাও। কত বড় সাহস! বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে আসে।'

'তামিমের আজ যে অবস্থা সাড়ে তিন শ' থেকে চার শ' রান উঠবে। আয়ারল্যান্ড আজ মাঠেই হাগামুতা করবে।'

আমি এদের উত্তেজনায় যুক্ত হতে পারছি না, কারণ বল চোখে দেখছি না। বল কোনদিকে যাচ্ছে তা-ও বুঝতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, টিভি পর্দায় খেলা দেখা উচিত ছিল। মাঠে এসে ভুল করেছি।

আমার সামনের সারির একজোড়া তরুণ-তরুণী আমাকে খেলায় মন দিতে দিচ্ছে না। তারা হয় নতুন বিয়ে করেছে, কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা সারাক্ষণই একে অন্যের ছবি তুলছে। একজন অন্যজনের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে পায়ের খেলাও খেলছে। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি। 'ভুভুজেলা' নামক বাদ্যযন্ত্রটি এই স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই যুগল ভুভুজেলার একটি মিনি সংস্করণ যোগাড় করেছে। বস্তুটি বাঁশির মতো না, চারকোণা, ফুঁ দিলেই ভুভুজেলার চেয়েও বিকট শব্দ হয়। এরা ক্ষণে ক্ষণে ভুভুজেলা বাজিয়ে আমাকে চমকাচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পাশে এক ভদ্রলোক বসেছেন। তিনি সারাক্ষণই উচ্চস্বরে মোবাইলে বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। খেলা কী হচ্ছে বা না-হচ্ছে সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই।

কে ? সামছু! আমি তো মাঠে খেলা দেখছি। ফজলু কই ? তারে টেলিফোনে পাচ্ছি না। ফজলুকে বলো আমারে যেন কল দেয়। রঙমিস্ত্রি পেয়েছ ? আচ্ছা আমি পাত্তা লাগাচ্ছি।

খেলা এগুচ্ছে, মোবাইলওয়ালা রঙমিস্ত্রির অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন।

খাদক প্রজাতির একজনকে দেখলাম, খেলার শুরু থেকেই তিনি খাবার স্টল থেকে একের পর এক খাবার নিয়ে আসছেন। শেষ হচ্ছে, আবার আনছেন। খাদ্য গ্রহণ চলছেই। আবহসঙ্গীতের মতো মুরগির হাড় চিবানোর শব্দ আসছে।

পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্যকে দেখে খুব মায়া লাগল। তাদের ডিউটি পড়েছে বক্সের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকার। চমৎকার খেলা হচ্ছে, বেচারারা উপস্থিত থেকেও খেলা দেখতে পারছে না, তাদের তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে উল্লসিত দর্শকদের মুখের দিকে। উল্লাসের কারণ জানার অধিকার তাদের নেই।

উল্লাসে বাধা পড়ল, ইমরুল কায়েস আউট। বাংলাদেশের টিমে ডমিনো অ্যাফেক্ট প্রবল। একা কেউ আউট হয় না, দলবল নিয়ে হয়। দেখতে দেখতে চার ব্যাটসম্যান শেষ। সাকিবের আউটে মাঠে নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা।

শেষ ভরসা আশরাফুল। সাত নম্বরে নেমে সে সবাইকে চমকাবে—এ-ই আমাদের বিশ্বাস। মাঠে আশরাফুল ঢোকামাত্র আমরা হাততালি দিলাম। আমাদের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে এল। হায় খোদা! এ তো দেখি পুরনো আশরাফুল। এক রান করে আউট। ব্যাট নিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে হাসিমুখে মাঠ থেকে বিদায়।

আমার পেছনে বসা তরুণের দল বলল, আশরাফুলকে এমন শাস্তি দেওয়া দরকার যেন তার সারা জীবন মনে থাকে। একটা লম্বা বাঁশ এনে...। বাক্যটি লিখলাম না। পাঠকদের কল্পনায় ছেড়ে দিলাম।

আশরাফুল আউট হওয়ার পরপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। শাওনকে বললাম, বাংলাদেশের পরাজয় আমি এত মানুষের সঙ্গে দেখব না। আমি চললাম।

শাওনও উঠে দাঁড়াল। দুঃখিত গলায় বলল, মাঠে বসে বাংলাদেশের বিজয় দেখব বলে তোমাকে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থা হবে কে জানত! সরি।

বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়ের খবর রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষদের কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের হতাশায় ম্রিয়মাণ মুখ দেখে দেখে ফিরছি। আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শাওন বলল, প্লিজ, এত মন খারাপ করবে না। পরের ম্যাচে আমরা অবশ্যই জিতব। এত মানুষের ভালোবাসা কখনো বৃথা যেতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাদটীকা

এ-কী কাণ্ড! এই খেলায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতেছে। অভিমান করে মাঠ ছেড়ে চলে আসায় আসল খেলাটা দেখা হলো না। আফসোস, আফসোস এবং আফসোস!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈদ ভয়ংকর!

ভাবতে অবাক লাগে, একসময় আমার ঈদও আনন্দময় ছিল। তখন আমাকে ঈদসংখ্যায় উপন্যাস লিখতে হতো না। কারণ 'ঈদসংখ্যা' নামক কোনো বস্তু ছিল না। বিটিভিতে ঈদের হাসির নাটক লিখতে হতো না, এই দায়িত্ব জনাব আমজাদ হোসেন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বিটিভির কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের কাছে শুনেছি, আমজাদ হোসেনের কাছ থেকে ঈদের নাটক আদায় করা কঠিন ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে কাগজ-কলম দিয়ে বিটিভির একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। নাটক শেষ হলে মুক্তি, তার আগে না।

মানুষের কোনো সুখই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমারও ঈদসুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের ফাঁদে পড়ে এক ঈদে হাসির নাটক লিখতে রাজি হলাম। সবাই খাল কেটে কুমির আনে, আমি খাল কেটে অক্টোপাস নিয়ে এলাম। এই অক্টোপাস আমাকে আট পায়ে আঁকড়ে ধরল। বাংলাদেশের মানুষদের ঈদের দিনে হাসানো আমার পবিত্র এবং মহান দায়িত্ব হয়ে গেল।

যে-কোনো দায়িত্বের সঙ্গে টেনশন থাকে, সেই দায়িত্ব যদি মহান হয় টেনশন 'মহা' হয়ে যায়। আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করি রোজার শুরুতেই। স্ক্রিপ্ট লিখি, স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয় না। আবার লিখি, আবার লিখি।

বিটিভির রিহার্সেল রুমে রিহার্সেল হয়। প্রতিবারই আমি উপস্থিত থাকি। রিহার্সেল শুনে নাটক কাটাকুটি করি। প্রযোজক বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এত কাটাকুটি করলে কীভাবে হবে ? প্রতিদিন নতুন সংলাপ দিলে আর্টিস্ট কীভাবে মুখস্থ করবে ?'

বিখ্যাত সব আর্টিস্ট, প্রায়ই তাদের অভিনয়ের প্যাটার্ন আমার পছন্দ হতো না। মুখ ফুটে বলতে পারতাম না। যেহেতু হাসির নাটক, সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই ভাবতেন দর্শক হাসানোর দায়িত্ব তাদের। অভিনয়ে স্থূলভাব চলে আসত। স্বাভাবিক সংলাপ তাঁদের অভিনয়ের গুণে অস্বাভাবিক শোনাত।

দৃশ্যগ্রহণও আমার মনের মতো হতো না। বড় অভিনেতাদের মুখের ওপর সবসময় ক্যামেরা ধরা থাকত। ছোট অভিনেতারা বলতে গেলে ক্যামেরার আড়ালেই থাকতেন।

ইনডোরের শুটিং হতো দুদিন। দ্বিতীয় দিনেই শুরু হতো তাড়াহুড়া। শেষ ঘণ্টা বাজার আগে দেখা যেত আট-নটি দৃশ্য ধারণ করা হয় নি। পরিচালক মাথায় হাত দিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিটিভি জমানায় (অন্য কোনো চ্যানেল যে জমানায় আসে নি, সেই জমানা) ঈদের দিন ঘুম ভাঙার পর থেকেই আমি আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকতাম। রাতে নাটক আছে। না জানি কেমন হবে ? যাদের জন্যে নাটক বানানো হয়েছে, তারা পছন্দ করবে তো ? প্রাণ খুলে হাসবে তো ? আনন্দ পাবে তো ? অসহনীয় টেনশনে ঈদ হয়ে যেত ভয়ঙ্কর।

এরপর বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক নোংরা এবং বিষাক্ত পানি প্রবাহিত হয়েছে, আমার জন্যে ঈদ ভয়ংকরই থেকে গেছে।

আগে একটা নাটক লিখতাম। টেনশন এক নাটকে সীমাবদ্ধ থাকত। এখন এক ঈদে পাঁচটা-ছ'টা করে নাটক লিখতে হয়। আমি নিজে প্রচারের দিন কোনো নাটকই দেখতে পারি না। কোনটা দেখব ? দর্শকরাও নাটক দেখেন না। তারা দেখেন বিজ্ঞাপন। 'লেড়কা সে লেড়কাকা ওজন ভারী'র মতো নাটকের চেয়ে বিজ্ঞাপন ভারী হয়ে গেছে।

আমি কঠিন প্যাঁচে পড়েছি। গোদের উপর ক্যান্সারের মতো ঈদের নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈদসংখ্যার লেখা। আমি রক্তের মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করছি।

ক্লান্ত চোখ ও ক্লান্ত চোখের পাতা
তাহার চেয়েও ক্লান্ত আমার পা।
মাঝ উঠোনে সাধের আসন পাতা
একটু বসি ?
জবাব আসে, 'না'।

AMARBOI.COM

ক্ষুদে গানরাজ

স্যার, আপনি কি গান গাইতে জানেন ?

না।

গান বোঝেন ?

না।

রাগ বিষয়ে জ্ঞান আছে ?

না।

মীড়, গমক, মূর্ছনা—এইসব কী ?

জানি না কী।

তাহলে ক্ষুদে গানরাজের প্রথম বিচারক হলেন কী জন্যে ?

এই প্রশ্নের একটাই উত্তর, 'ভুল হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে ভুল করার অধিকার আমার আছে।'

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন একবার শিশুদের কবিতা আবৃত্তির বিচারক হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স কুস্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হয়েছিলেন।

ক্ষুদে গানরাজের আরেকজন বিচারকের নাম মেহের আফরোজ শাওন। সে আমার পরিচিত। সে গান জানে, গান বোঝে, রাগ জানে, মীড়-গমক-মূর্ছনা জানে। এরকম একজন বিচারক পাশে থাকলে নির্ভয়ে থাকা যায়। তার আবার আমার প্রতি উচ্চ ধারণা। সে মনে করে আমার কান অত্যন্ত পরিষ্কার। গান ভালো হচ্ছে নাকি হচ্ছে না—এটা আমি অতিদ্রুত ধরতে পারি।

শাওন অন্য স্ত্রীদের চেয়ে আলাদা না। স্ত্রীরা নির্গুণ স্বামীর ভেতরও গুণ আবিষ্কার করে ফেলে।

বিচারকের দায়িত্ব পালন শুরু হলো। আমি কঠিন ভাইবা পরীক্ষা নিচ্ছি এরকম মুখ করে বসে থাকি। শাওন চাপা গলায় বলে, ভুরু কুঁচকে আছ কেন ? বাচ্চাদের দিকে রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে আছ কেন ? ওরা ভয় পাচ্ছে। আমার নিজেরই তোমার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে, ওর ভয় পাবে না কেন!

আমি চাপা গলায় বললাম, ওরা আমাকে মোটেই ভয় পাচ্ছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। তুমি গানে ভুল ধরছ, আমি ধরছি না।

তুমি একজন বিচারক। ওরা ভুল করলে তুমি ধরবে না!

আমি বললাম, ভুল ধরার যে ছাকনি আমার কানে আছে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ভুল ধরতে পারছি না। যা শুনছি তা-ই মনে হচ্ছে শুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকরা বলুন, যে বাচ্চাটি ক্লাস ওয়ানে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তাল-লয়-সুর ঠিক রেখে গান করছে আমি তার কী ভুল ধরব ? ভুল ধরায় আমার কোনো আনন্দ নেই, আমার গান শোনাতেই আনন্দ।

মৃত্তিকা নামের যে মেয়েটি ক্ষুদে গানরাজের প্রধান সমন্বয়কারী তাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি, আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় সে তার বাবার হাত ধরে প্রায়ই আসত। এসেই দৌড়ে টয়লেটে ঢুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত বাথটাবে। তখন তাকে হাতি দিয়ে টেনে তোলাও ছিল অসম্ভব। এই মেয়েটি ছিল ক্ষুদে দস্যি। তানিশা নামের আরেকটি মেয়ে যে উপস্থাপনার কঠিন এবং বিরক্তিকর কাজটি হাসিমুখে করে তাকেও অতি শৈশব থেকে চিনি। সে আরেক দস্যি। তার প্রধান কাজ ছিল, বাইরে থেকে বাথরুমের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে থাকা এবং কিছুক্ষণ পর পর বলা—দেখে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি।

আসলে ক্ষুদে গানরাজে ঢুকে আমি ক্ষুদেদের জগতে ঢুকে পড়েছি। এতগুলি গানের পাখি আর দু'জন একসময়কার ক্ষুদে দস্যিকে নিয়ে আমার যাত্রা। Alice in wonderland এর আশ্চর্য জগতে আমার বিচরণ।

জীবন শুকায়ে গেলে করুণাধারায় আশ্রয় নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পরামর্শ দিয়েছেন। আমার জীবন শুকিয়ে যায় নি। সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তারপরেও আমি সুরের করুণাধারায় অবগাহন করতে পারছি—এ আমার পরম সৌভাগ্য।

একটাই কষ্টকর ব্যাপার—বাচ্চারা যখন বাদ পড়ে যায়। কী অবাক দৃষ্টিতেই না তারা তাকায়! তাদের চোখের দৃষ্টি বলে দেয়—আমি এত সুন্দর করে গাইলাম আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে দিলে! বড়দের জগতের নিষ্ঠুরতার পরিচয়ে তাদের ক্ষুদ্র ভুবন হয়ে যায় এলোমেলো। বাদ পড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের প্রতি কিছু বাবা-মা অত্যন্ত হৃদয়হীন আচরণ করেন। একটি মেয়ে দর্শকদের ভোটের কারণে বাদ পড়ল। সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। এর মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হলেন মেয়েটির মা। শুরু করলেন মার। কী আশ্চর্য কাণ্ড। তাঁর মেয়ে ক্ষুদে গানরাজ হবে এই স্বপ্নে মহিলার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তিনি তা জানেন না।

আমাদের ষোল কোটি মানুষের দেশে ষোলজন ক্রিকেট প্লেয়ার নেই, ষোলজন ফুটবল প্লেয়ার নেই, আর এতগুলি গানের পাখি ? আমি খুবই অবাক হই। অনুষ্ঠান শেষে বিস্ময়বোধ নিয়ে বাড়ি ফিরি, আবারও বিস্ময় নিয়ে পরের অনুষ্ঠানে যাই। কেউ কেউ বাদ পড়ে, ইয়েলো জোন বা ডেনজার জোনে চলে যায়। তারা গলা ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করে। তাদের কান্না দেখে প্রধান বিচারক মেহের আফরোজ কাঁদেন। একটা ইন্টারেস্টিং দৃশ্য হিসেবে ক্যামেরা তা রেকর্ড এবং প্রচার করে। আমি ক্যামেরার ব্যাপারটা জানি বলে নিজের চোখ আড়াল করি। শিশুরা কাঁদছে, তানিশা কাঁদছে। দুই বিচারক কাঁদছে। কোনো মানে হয় ?

গানের পাখিদের একটির নাম রানা। সে অবশ্যি সারাক্ষণই হাসে। বাদ পড়ে গেলেও দাঁত বের করে হাসে। উচ্চারণ ভয়াবহ খারাপ। আমাকে ডাকে 'ছার', স্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। ছেলেটি খুলনা শহরে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে বাবা-মা'র সংসার চালাতো। এখন ক্ষুদে গানরাজ হওয়ার সম্ভাবনা তার প্রবল। প্রথম দশজনের ভেতর সে চলে এসেছে—ইউরোপ, আমেরিকায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের হাতছানি এখনই তার জন্যে শুরু হয়েছে। তার জন্যে অপেক্ষা করছে অন্য এক জগত। যে জগত ভিক্ষাবৃত্তির জগত না।

আরেকটি ছেলের কথা বলি—নাম শান্ত মিয়া। বাড়ি পাবনা। তার মা বিড়ি বেঁধে দৈনিক নয় টাকা পায়। এতে মাতা-পুত্রের সংসার চলে। ছেলেটি প্রথম বারোজনের ভেতর চলে এসে বাদ পড়ল। আমাকে এবং শাওনকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এখন আমি কই যাব? মানুষের বাসাবাড়িতে কাজের ছেলের চাকরি নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ নাই। আগেও কাজ করি খেতাম, এখনো খাব।

আমি তাকে বললাম, তোমার মা'কে আমি নুহাশপল্লীতে একটা চাকরি দিতে পারি। তুমি থাকবে তোমার মা'র সঙ্গে। তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে। তুমি পড়াশোনা করবে। আগে পড়াশোনা তারপর গান। রাজি আছ?

শান্ত মিয়া বলল, স্যার আমি রাজি।

মাতা-পুত্র এখন নুহাশপল্লীতে আছে। শান্ত মিয়া ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছে। শান্ত মিয়া অবসর সময়ে একটা কঞ্চি হাতে নুহাশপল্লীতে একা একা ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনের আনন্দে গান করে— আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে...

উকিল মুন্সির বিখ্যাত বিচ্ছেদি গান। তার গান নুহাশপল্লীর বৃক্ষদের স্পর্শ করে। মানুষের কষ্ট সবার আগে টের পায় বৃক্ষরাজি। এই তথ্য আমরা জানি না।

AMARBOI.COM

পাদটিকা

Failure is very difficult for anyone to bear, but very few can manage the shock of early success.

Maurice Valency

(পরাজয় সহ্য করা সবার জন্যেই কঠিন, আবার শুরুতেই সাফল্যের ধাক্কাও অনেকেই হজম করতে পারে না।)

কুইজ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নালিশ গেছে। ভুল-ভাল উচ্চারণে জনৈক উর্দুভাষী (হিন্দিও হতে পারে) গায়ক তাঁর দু'টা বিখ্যাত গান রেকর্ড করে ফেলেছে। রেকর্ড দু'টি এই মুহূর্তে প্রত্যাহার করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে রেকর্ড শুনে বললেন, গায়কের কণ্ঠের মাধুর্যে উচ্চারণের ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। রেকর্ড দু'টা থাকবে।

গায়কের নাম কী?

উত্তর : কে. এল. সায়গল (গায়ক এবং অভিনেতা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ভৌতিক গল্পের পোস্টমর্টেম

সম্প্রতি আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে একটি ভৌতিক গল্পকে কাটাছেঁড়া করার। আমি যে খুব আগ্রহের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়েছি তা-না। গল্প থাকবে গল্পের মতো। তাকে কাঁটাছেঁড়া করা হবে কেন? একজন মানুষের জীবনে নানান ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটে। অভিজ্ঞতাগুলো তার ব্যক্তিগত গল্প। এইসব গল্পের কিছু থাকে অতিপ্রকৃত বা ভৌতিক। এই গল্পগুলো সে গভীর মমতায় লালন করে। বৃদ্ধবয়সে নাতি-নাতনিদের নিয়ে অভিজ্ঞতার গল্প বলতে বলতে নিজে রোমাঞ্চিত হন। নাতি-নাতনিরা অবাক হয়ে বলে, সত্যি এমন ঘটেছিল? সাধারণত এ ধরনের গল্পে পালক যুক্ত হতে হতে মূল গল্প হারিয়ে যায়।

গল্পে আছে এক মহিলার এক ছেলের জন্ম দিয়েছে, গায়ের রঙ কালো। ধাত্রী তার বাড়ি ফিরে গল্প করল, অমুক মহিলার এক ছেলে হয়েছে। গায়ের রঙ কাকের মতো কালো। লোকমুখে গল্প ছড়াতে লাগল। শেষ অংশ হচ্ছে—এক মহিলা একটা কাকের জন্ম দিয়েছে। কাকটা 'কা' 'কা' করছে তবে ফাঁকে ফাঁকে 'মা' ডাকছে। কা কা মা। মা কা কা...

জটিল ভৌতিক অভিজ্ঞতা প্রায় সময়ই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় না। যিনি গল্পটি বলছেন তার আত্মীয়ের অভিজ্ঞতা। সেই আত্মীয় আবার জীবনে কখনো মিথ্যা বলেন না টাইপ।

যখন আমার বয়স কম ছিল, তখন বেশ কয়েকবার গল্পের পেছনে দৌড়িয়েছি। বরিশাল বিএম কলেজে কেমিস্ট্রির M.Sc. পরীক্ষার এক্সটারনাল হিসেবে একবার গিয়েছি। সেখানে শুনলাম মাইল তিনেক দূরে একটা ভাঙা রহস্যময় কুয়া আছে। কুয়ার পানির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে পানি হঠাৎ খলবল করে উঠে এবং প্রশ্নের উত্তর দেয়।

পরীক্ষার ভাইবা শেষ করে নৌকা নিয়ে আমি অদ্ভুত কুয়া দেখতে গেলাম। বরিশালের সরু খালবিলে নৌকা নিয়ে যাওয়া এক ধরনের দিগদারি। জোয়ার ভাটা দেখে নৌকা ছাড়তে হয়। তিন মাইল যেতেই আমার সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। ফলাফল শূন্য। কুয়াতে মুখ রেখে অনেকক্ষণ "হ্যালো হ্যালো, তুমি কে? কথা বলো।" এইসব করলাম। কুয়া বা কুয়ার পানি কোনো জবাব দিল না। খলবলানিও নেই। যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন, আজকের ঘটনাটা বুঝলাম না। মনে হয় আপনেরে 'ভয়' খাইছে। কুয়া কেন আমাকে 'ভয় খাইছে' কে বলবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা নিতে একবার গেলাম পটুয়াখালি সরকারি কলেজে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষক হয়েছি। গা থেকে ছাত্রের গন্ধ যায় নি। সিনিয়র শিক্ষকরা এত দূরে পরীক্ষা নিতে আসতে চান না বলেই আমাকে পাঠানো।

কলেজ কম্পাউন্ডের একটা ঘরে আমার থাকার জায়গা। আমার জন্যে আলাদা বাবুর্চি। এই বাবুর্চি মনে হয় লবণ ছাড়া রান্নার কোর্স নিয়েছে। কোনো খাবারেই লবণ হয় না। তবে সে লবণের অভাব পুষিয়ে দিত ভূতের গল্প করে। তাদের বাড়িতে একটি পোষা ভূত আছে। এই ভূতকে যদি বলা হয় চাপকল টিপে পানি বের করতে, সে বাধ্য ছেলের মতো চাপকল টিপে পানি বের করে। ঘর ঝাঁট দেয়। চাপকল উঠানামা করে। কল চাপতে কাউকে দেখা যায় না। বাবুর্চি বলল, স্যার কষ্ট করে যদি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলা দেন তাহলে আপনাকে ভূতের খেলা দেখায়ে দিতাম। যেতে হবে রাতে।

রাতেই গেলাম। ভূতের চাপকলে পানি তোলা। উঠান ঝাঁট দেওয়া কিছুই দেখলাম না। বাবুর্চি বলল, আপনি অপরিচিত তো আপনারে দেখে শরম পাইছে। সামনে আসতেছে না।

বাবুর্চি তার বাড়িতে খাবার আয়োজন করে রেখেছিল। প্রতিটি আইটেমের লবণ ঠিক ছিল। খেতেও হয়েছিল অসাধারণ। তার বাড়িতে খাওয়া তপসে মাছের স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটে কেউ কেউ সরাসরি আমাকে ভূত বা জ্বিন দেখাতে আসেন। একজন এসেছিলেন কক্সবাজার কিংবা সোহাজারি থেকে। তিনি নিজে একজন কবি এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তিনি বললেন, স্যার আমি জ্বিন দেখাতে পারব না। চর্মচক্ষে তাদের দেখা যায় না। যারা বলে জ্বিন দেখাবে তারা মিথ্যা কথা বলে। তবে আমি জিনের মাধ্যমে খাবার এনে খাওয়াব। আপনি কী খেতে চান বলুন।

AMARBOI.COM

আমি বললাম, মুরগির রোস্ট।

জ্বিন জাতি ঝাল জাতীয় খাবার আনে না। মিষ্টি জাতীয় কোনো নাম বলুন।

আমি বললাম, বগুড়ার মিষ্টি দই।

শুকনা খাবারের নাম বলতে হবে। ভেজা খাবার এরা আনে না।

লাড্ডু খেতে পারি। লাড্ডু কি আনতে পারবে ?

অবশ্যই পারবে। বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করতে বলুন। জ্বিনরা আলোতে আসে না।

বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করা হলো। লাড্ডুর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আধঘন্টা পার হলো। লাড্ডু পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক বললেন, জ্বিন আসতে চাচ্ছে না।

গায়ক এস আই টুটুল একবার কুষ্টিয়া থেকে দুজন জ্বিনসাধক নিয়ে এল। এরা নাকি সুপার জেনুইন। মুহূর্তের মধ্যে জ্বিন হাজির করবে। জ্বিন আমাদের প্রশ্নের উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে। জ্বিন এল না। প্রশ্নের উত্তর অনেক পরের ব্যাপার। দুই জ্বিনসাধক টুটুলকে বলল, স্যারের সঙ্গে এক কঠিন জ্বিন থাকে। ওই জ্বিনকে দেখে ভয় পেয়ে তাদের জ্বিন আসে নাই। আমাকে বাদ দিয়ে আসর বসালেই নাকি জ্বিন আসবে। আমি তাতেই রাজি হয়েছি। টুটুল ইউরোপ-আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে বলে আসর বসানোর সময় বের করতে পারছে না।

ছোটবেলায় যেসব ভূতের গল্প শুনতাম এখন আর শুনি না। আমার মা'র আপন চাচির মুখে শুনেছি, জন্মের পর পর জ্বিন বা ভূত তাকে নিয়ে উঁচু তালগাছের মাথায় রেখে দিয়েছিল। সারা গ্রামের মানুষ মশাল-লণ্ঠন জ্বেলে তালগাছ ঘিরেছে। গাছে মই লাগিয়ে শিশুকে নামিয়ে এনেছে। আমার মা বললেন, ঘটনা সত্য। তিনি ছোটবেলা থেকেই শুনছেন।

মাতৃহারা বানর মানবসন্তান চুরি করে গাছে নিয়ে যায়। এমন কিছু কি ঘটেছে?

গ্রামাঞ্চলে জ্বিন বা ভূত তাড়ানোর ওঝাদের একসময় ভালো প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এই শ্রেণী এখন মনে হয় উঠে গেছে। গতবার গ্রামে গিয়ে ওঝার সন্ধান করলাম। ওঝাদের কাছ থেকে কিছু মন্ত্র লিখে নেব। গল্প-উপন্যাস লেখায় কাজে দেবে। জ্বিন-ভূতের একজন ওঝাকে পাওয়া গেল। সে তার পুরনো পেশা ছেড়ে দিয়ে রুয়াইল বাজারে পানে খাওয়ার ঝিনুকের চুন বিক্রি করে। তাকে খবর দিয়ে আনা হলো। সে দুঃখের সঙ্গে বলল, পল্লী বিদ্যুতের কারণে জ্বিন-ভূত নাই বললেই হয়। সেই কারণেই সে ওঝাগিরি ছেড়ে দিয়েছে। জ্বিন-ভূত তাড়াবার কিছু মন্ত্র তার কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করলাম। সে মন্ত্র জানাতে রাজি হলো না। সম্ভবত তার কাছে কোনো মন্ত্র নেই।

আমার শৈশবের কিছু অংশ কেটেছে নানার বাড়ি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে। সেখানে ভূতের আছর হওয়া এবং ওঝা দিয়ে ভূত তাড়ানো দেখেছি। বেশির ভাগ সময় আছর হতো যুবতী মেয়েদের উপর। ওঝা এসে মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করার পর আছর হওয়া কন্যা যে কাজটি প্রথম করত তা হলো টেনেটুনে শাড়ি খুলে ফেলা। ঘটনা দেখে বয়স্করা নিশ্চয় মজা পেতেন। আমার কাছে দৃশ্যটা ছিল ভীতিকর। ওঝার সঙ্গে কথোপকথন হতো। মেয়েটিই বিকৃত গলায় কথা বলত।

ওঝা : তুই কে?

মেয়ে : আমি অমুক (একটা নাম বলত। পুরুষের নাম।)

ওঝা : একে ধরেছিস কেন?

মেয়ে : সে সিনান করে আমার গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে। এইজন্যে ধরেছি।

ওঝা তখন মন্ত্র শুরু করতেন। মন্ত্রের সবটাই অশ্লীলতম বাক্যে ভর্তি।

মন্ত্র পাঠ এবং সরিষার দানা ছুড়ে মারার পর ভূত চলে যেত। মেয়েটা তখন পরনের খুলে ফেলা শাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কুকুরের মতো চারপায়ে দ্রুত ঘরের দিকে যেত। বেশির ভাগ সময় দরজার চৌকাঠে বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো বিষয়টা অবদমিত যৌন কামনার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই না। গায়ের কাপড় খুলে ফেলা, আগ্রহ নিয়ে ওঝার অশ্লীল কথাবার্তা শোনার অন্য কারণ নেই। গায়ের কাপড় খুলে ফেলার বিষয়টি এত নিয়মিত ঘটত যে ময়মনসিংহের গ্রাম্য বাগধারায় বিষয়টি উঠে এসেছে। উদাহরণ—"জ্বর হয়ে বৌ নেংটা হইল, সেই থেকে বৌয়ের অভ্যাস হইল।" এই বাগধারার অর্থ একবার প্রবল জ্বরের ঘোরে নতুন বৌ গায়ের কাপড় খুলে ফেলে দিল। কেউ তাকে কিছু না বলায় সে লাই পেয়ে গেছে। এখন অকারণেই সে গায়ের কাপড় খোলে।

আগেই বলেছি সবার জীবনেই কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা ঘটে। আমার জীবনেও বেশ কয়েকবার ঘটেছে। আমি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। সববার পেরেছি তা-না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তি পরাস্ত হয়েছে। যুক্তির পরাজয় আমার পক্ষে মানা কঠিন। কারণ আমার মধ্যে মিসির আলি বাস করেন। তিনি মনে করেন যুক্তির বাইরে কিছুই নেই।

নুহাশপল্লীর একটা ভৌতিক অভিজ্ঞতা বলি—সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আমি একা নুহাশ পল্লীর দিঘির দিকে যাচ্ছি। ওষুধি বাগানের কাছাকাছি এসে মনে হলো, কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণকারীর পায়ে নূপুর। নূপুরের শব্দ করে করে সে আসছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লে নুপূরের শব্দ বন্ধ। হাঁটা শুরু করলেই নূপুরের শব্দ। তিনবার পরীক্ষা করলাম। তিনবারই এই ঘটনা। আতঙ্কে শরীর জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করব তাও পারছি না। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত। চিৎকার করে কাউকে ডাকব? নাকি দৌড়ে পালাব? দোটানা অবস্থায় নিজে নিজেই রহস্য ভেদ করলাম। আমার প্যান্টের বেল্টটা ঠিকমতো লাগানো হয় নি। বেল্টের ধাতব আংটা ঝুলছে। যখনই হাঁটছি তখনি সেই আংটা শরীরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝুন ঝুন শব্দ তুলছে। তাতেই মনে হচ্ছে নূপুর পায়ে কেউ একজন আমাকে অনুসরণ করছে।

তবলার ঠুকঠাক অনেক হয়েছে। এখন মূল গল্পে যাই। একটি ভূতের গল্পের পোস্টমর্টেম করি।

প্রস্তাবনা

মাসুদ আখন্দ তার বাবা-মা'র সঙ্গে সুইডেনে থাকত। এখন সে বাংলাদেশে এসে ফিল্ম মেকিং জাতীয় কাজকর্ম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। তার বাবা-মা থাকেন সুইডেনে। আমি ইউরোপে বেড়াতে গেলে মাসুদের বাবা-মা দুজনের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল। দুজনই নিতান্তই ভালো মানুষ। তাঁদের একটাই কষ্ট, নিজ দেশ ফেলে অন্যের দেশে বাস করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি মাসুদের বাবা মারা গেছেন। তার মা এসেছেন বাংলাদেশে। এই মহিলার শৈশব জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। তাঁর ধারণা এই ঘটনাটির কোনো ব্যাখ্যা নেই। একমাত্র মিসির আলিই ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তিনি মিসির আলির বিকল্প হিসেবে তাঁর ছেলেকে পাঠালেন আমার কাছে। আমি যদি ব্যাখ্যা দিতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল গল্প

মেয়েটির বয়স সাত কিংবা আট (মাসুদের মা'র কথা বলছি)। তার নানার বাড়িতে কী একটা উৎসব। সে একদিনের জন্যে নানার বাড়ি যাবে। নানার বাড়ি খুব যে দূরে তা-না। হাঁটাপথে দু'ঘণ্টার মতো লাগে। ঠিক হয়েছে মেয়েটাকে তার বাড়ির কামলা ভোরবেলা নিয়ে যাবে। আবার ওইদিনই ফেরত নিয়ে আসবে।

কামলার নাম ঠাকুর। নাম ঠাকুর হলেও সে মুসলমান। মেয়েটির বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ঘর তুলে স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। তাদের কোনো সন্তানাদি নেই। ঠাকুর এই মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করে।

যেদিন উৎসবে যাওয়ার কথা সেদিন ঠাকুর অন্ধকার থাকতে থাকতে চলে এল। সেই সময় ঘড়ি দেখার চল ছিল না। কারও বাড়িতে ঘড়ি থাকত না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সময় আঁচ করার চেষ্টা করা হত। ঠাকুর যে গভীর রাতে এসেছে তা কেউ বুঝতে পারল না। মেয়েটা ঠাকুরের সঙ্গে রওনা হলো। ঠাকুর প্রায় দৌড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা যতই বলে 'চাচা আস্তে হাঁটেন' ততই ঠাকুর দ্রুত পা ফেলে।

একসময় ঠাকুর মেয়েটিকে নিয়ে তার নানার বাড়িতে উপস্থিত হলো। বাড়ির সবাই ঘুমাচ্ছে। তাদের ডেকে তোলা হলো। মেয়ের মামা গভীর রাতে মেয়েটিকে নিয়ে আসার জন্যে ঠাকুরকে অনেক গালাগালি করলেন। ঠাকুর মাথা নিচু করে গালি শুনল তারপর অভিমান করেই একা ফিরে গেল। যাওয়ার সময় কারও কাছ থেকে বিদায়ও নিল না।

গল্পের অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক অংশ হচ্ছে, পরদিন ঠাকুরকে ডেকে পাঠানো হলো। কৈফিয়ত তলবের জন্যে, কেন সে কাউকে কিছু না জানিয়ে মেয়েটাকে রেখেই চলে গেছে! গভীর রাতে বাচ্চা একটা মেয়েকে নিয়ে কেনইবা সে রওনা হলো!

গল্পের ভৌতিক অংশ হলো গত তিন দিন তিন রাত ধরে ঠাকুর জ্বরে অচেতন। বিছানা থেকে নামার অবস্থা তার নেই। তার স্ত্রী জানাল, গত তিন দিন ধরে সে তার স্বামীর পাশে। মানুষটা এখন যায় তখন যায় অবস্থা। ঠাকুর চিঁচিঁ করে বলল, আম্মারে নিয়া আমি কোনোখানে যাই নাই। আমি ঘাড় ফিরাইতে পারি না এমন অবস্থা।

তাহলে বাচ্চা মেয়েটিকে কে নিয়ে গেছে? ভূত, জ্বিন?

গল্পের পোস্টমর্টেম

জ্বিন-ভূতের কোনো দায়িত্ব পড়ে নি মেয়েটিকে নানার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার। কাজেই জ্বিন-ভূত বাদ।

ঠাকুর মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়েছে, এটা সবাই দেখেছে। মেয়েটি বা তার নানার বাড়ি লোকজন ঠাকুরকে দেখেছে। ঠাকুর জ্বরে তিন দিন ধরে অচেতন বা প্রায় অচেতন এটাও সত্যি। এখানে মিথ্যা ভাষণের প্রয়োজন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে মেয়েটিকে কে নিয়ে গেছে ?

আমার ব্যাখ্যা ঠাকুরই নিয়ে গেছে। সে গভীর রাতে ঘোরের মধ্যে বের হয়েছে (স্লিপ ওয়াকিংয়ের মতো)। তার মাথায় আছে বাচ্চা মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে হবে। সে ঘোরের মধ্যেই বের হয়েছে। ঘোরের মধ্যে মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়েছে।

প্রশ্ন আসতে পারে, এই সময় তার স্ত্রী কোথায় ছিল ?

স্ত্রী ঘুমাচ্ছিল। রোগীর সেবা করতে গিয়ে সে ক্লান্ত এবং অঘুমা। তার ঘুমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক। দীর্ঘসময় তার ঘুম ভাঙে নি, কারণ রোগী পাশে শুয়ে আহ্ উহ্ করছে না। রোগী বাচ্চা মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে গিয়েছে।

পাদটিকা

একটি চমৎকার ভৌতিক গল্প হত্যা করা হলো। কাজটা ভুল এবং অন্যায়। ভৌতিক গল্প থাকবে গল্পের মতো। সে সবাইকে ভয় দেখাবে। এতেই তার সার্থকতা এবং পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

চিরকাল এইসব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ ওষ্ঠাধর।
জন্মান্তের নবপ্রাতে সে হয়তো আপনাতে পেয়েছে উত্তর।

তাঁর কথাই মনে রাখা আমার উচিত ছিল। গল্প হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি

আমার শৈশবের একটি অংশ নাপিতের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কেটেছে। বাবা এক হিন্দুস্তানি (ভোজপুরি) নাপিতের ব্যবস্থা করেছিলেন যে বাসায় এসে বাচ্চাদের চুল কেটে দিত। নরুন দিয়ে নখ কাটত। নাপিতের স্বাস্থ্য এবং গোঁফ ছিল দেখার মতো। তাকে দেখামাত্র পালিয়ে যাওয়া ছিল আমার প্রথম রিফ্লেক্স অ্যাকশান। পালিয়ে রক্ষা নেই, নাপিতই আমাকে ধরে আনত। মাটিতে বসিয়ে দুই হাঁটু দিয়ে মাথা চেপে ধরত। কান্নাকাটি চিৎকারে কোনো লাভ হতো না। ছেলেমেয়েদের কান্না এবং চিৎকারকে মা কোনোরকম গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর থিওরি হলো বাচ্চারা কাঁদবে, চিৎকার করবে, এটা তাদের ধর্ম। হাত-পা না ভাঙলেই হলো।

ক্লাস ফোরে ওঠার পর ভোজপুরি নাপিতের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। মা এক দিন হাতে একটা সিকি (পঁচিশ পয়সা) ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যা সেলুনে চুল কেটে আয়। জীবনের প্রথম সেলুনে চুল কাটতে গেলাম। নাপিতের প্রথম প্রশ্ন, পয়সা এনেছ?

আমি হাতের মুঠি খুলে সিকি দেখালাম।

চুপ কইরা বইসা থাকো। পাও নাড়াবা না। সেলুন কোনো দুষ্টামির জায়গা না।

আমি চুপ করে বসে দোকানের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। বোররাক নামক এক প্রাণীর বাঁধানো ছবি। বোররাক হচ্ছে একটা পাখাওয়ালা ঘোড়া। এর পিঠে চড়েই নবিজী (দঃ) মেরাজ শরীফে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ছবিটি ক্ষুদিরামের। তাঁর গলায় ফাঁসের দড়ি। কয়েকজন ইংরেজ তাঁকে ঘিরে তাকিয়ে আছে। একজনের হাতে ঘড়ি। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় ঘড়ি দেখে ইশারা দেওয়ার পর ফাঁসি কার্যকর হবে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়েই অতি বিখ্যাত গান—'এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। গানের প্রসঙ্গ আনলাম। কারণ আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি—পাঠকদের কাছ থেকে। ফাউনটেনপেন অনেকদিন লেখা হলো, কালি শেষ হয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক।

ছবির কাজে হাত দিচ্ছি। এখন ব্যস্ততা ছবি নিয়ে। ছবির নাম 'ঘেঁটুপুত্র কমলা'। ছবি নিয়ে বলি, আমার মতো প্রবীণরা 'ঘেঁটু' শব্দের সঙ্গে পরিচিত। এই সময়ের তরুণরা না।

সুনামগঞ্জ এলাকার জলসুখা গ্রামের বাউল আখড়ায় প্রথম ঘেঁটুগান শুরু হয়। নাচ-বাজনা এবং গান। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, গ্যানের সুর হলো ক্লাসিক্যাল ধারায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি রূপবান বালককে মেয়ে সাজানো হতো। সে নেচে নেচে গান করত। মাঝে মাঝে দর্শকদের কোলে বসে তাদের গলা জড়িয়ে ধরত।

সংগীতের এই ধারায় অতি দ্রুত কদর্যতা ঢুকে যায়। নারীবেশী কিশোরদের জন্যে পুরুষরা লালায়িত হতে শুরু করেন। একসময় বিত্তবানদের মধ্যে ঘেঁটপুত্র কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে এনে রাখা রেওয়াজে পরিণত হয়। বিশেষ করে সিলেট-ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে তিন মাসের জন্যে ঘেঁটু রাখা রেওয়াজে পরিণত হয়। কারণ এই তিনমাস হাওর থাকে জলমগ্ন। আমোদ-ফুর্তিতে সময় কাটানো ছাড়া কিছু করার নেই। আমজনতা সময় কাটায় তাস খেলে, 'দবা' (দাবা) খেলে, গানবাজনা করে। শৌখিনদার বিত্তবানরা তিনমাসের জন্যে ঘেঁটুপুত্র নিয়ে আসেন। ঘেঁটুপুত্র রাত্রিযাপন করে শৌখিনদের সঙ্গে। শৌখিনদারের স্ত্রী চোখের জল ফেলেন। স্ত্রী ঘেঁটুপুত্রকে দেখেন তার সতীন হিসেবে। প্রাচীন সাহিত্যেও বিষয়টা উঠে এসেছে—

"আইছে সতীন ঘেঁটুপুলা
তোরা আমারে বাইন্ধা
ফেল হাওরে নিয়া..."

প্রকাশ্য সমকামিতার বিষয়টা সেই সময়ের সমাজ কী করে স্বীকার করে নিয়েছিল আমি জানি না। তবে আনন্দের বিষয় ঘেঁটুগান আজ বিলুপ্ত। সেই সঙ্গে বিলুপ্ত সংগীতের একটি অপূর্ব ধারা।

আমার সংগ্রহের ঘেঁটুগানগুলো 'ঘেঁটুপুত্র কমলা'য় ব্যবহার করব। প্রাচীন আবহ তৈরির চেষ্টা করব। কেন জানি মনে হচ্ছে এটিই হবে আমার শেষ ছবি।

ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ নিজের টাকায় ছবিটা করব। অন্যের টাকায় ছবি করার অর্থ নিজেকে কিছুটা হলেও বন্ধক রাখা। দুঃখের ব্যাপার হলো ছবি তৈরিতে যে বিপুল অংকের অর্থ লাগে তা আমার নেই।

ছবি বানাতে গিয়ে টাকার সমস্যায় পড়লেই আমি আসাদুজ্জামান নূরের কাছে যাই। নূর প্রথম যে বাক্যটি বলেন তা হলো, টাকা কোনো ব্যাপারই না। আপনার কত টাকা লাগবে?

এবারও অতীতের মতো একই কথা বলে আমার হাত থেকে বাঁচার জন্যেই হয়তো জার্মানিতে গিয়ে বসে রইলেন। তাঁর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

IDLC নামক এক অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ছবি বানানোর জন্যে তারা আমাকে টাকা ধার দেবে কি না। তাদের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ছবি বানানোর জন্যে আমরা টাকা দিই না। তবে আপনাকে অবশ্যই দেব।

এদের কথা শুনে আমার প্রাথমিক শঙ্কা দূর হয়েছে। তারচেয়ে বড় কথা, শেষ খুঁটি চ্যানেল আইয়ের সাগর তো আছেই। সাগরের সঙ্গে প্রচলিত একটি গল্প এরকম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকায় ফিল্মের ওপর ফ্রিল্যান্স লেখা লেখে এমন এক সাংবাদিক গিয়েছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছে, সাগর ভাই, একটা ছবি বানানোর খুবই শখ।

সাগর : নাটক, সিনেমা এইসব আগে কখনো বানিয়েছ ?

সাংবাদিক : না। তবে এইসব বিষয়ে আমার ব্যাপক পড়াশোনা।

সাগর : চিত্রনাট্য কি তৈরি ?

সাংবাদিক : শুরু করেছি, এখনো শেষ হয় নাই।

সাগর : ছবির বাজেট কত ?

সাংবাদিক : আপনি যা দেন তার মধ্যে শেষ করে ফেলব ইনশাআল্লাহ।

সাগর : খোঁজ নাও তো শেরাটনের বলরুম কবে খালি।

সাংবাদিক : কেন সাগর ভাই ?

সাগর : ছবির মহরত করবে না ?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবন শুকায়ে গেলে করুণাধারায় যেতে হয়। ফিল্মমেকারের জীবন শুকায়ে গেলে তারা যায় সাগরের কাছে। লোনা পানির সাগর না, চ্যানেল আইয়ের সাগর।

'ঘেটুপুত্র কমলা' ছবি নিয়ে ব্যস্ততার পর্ব চলছে এখন। ফাউনটেনপেনের আর কোনো পর্ব লেখা এই কারণেই বন্ধ।

AMARBOI.COM

পাদটিকা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু ঘেঁটুগানের ফসল (লেটো গান, জিনিস একই)। তাঁর সংগীতের প্রথম পাঠ হয় লেটো গানের দলে।

কুইজ

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয়েছে। আমরা সাপ-লুডু ছাড়া তেমন কিছু খেলতে পারি না। তাতে কী হয়েছে ? আমাদের আহ্লাদের সীমা নেই। পাড়ায় পাড়ায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ উড়ছে। অনেক বছর আগে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে হেরে গিয়েছিল। আমি তখন ময়মনসিংহে—'অয়োময়' নামের ধারাবাহিক নাটকের ইউনিটের সঙ্গে আছি। আর্জেন্টিনার পরাজয়ের পর পর বিশাল জঙ্গি মিছিল বের হলো। স্লোগান—আর্জেন্টিনার পরাজয় মানি না, মানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দড়িতে দুজনের ফাঁসিও চাওয়া হলো। একজন রেফারি, আরেকজন হচ্ছে আর্জেন্টিনার বিপক্ষের গোলদাতা। তাঁর নাম মনে নেই।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে কুইজ বিশ্বকাপ নিয়েই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ফুটবল খেলার শুরুটা কীভাবে হয়?

উত্তর : চীনের মিং ডায়ানাস্টির গোড়ার দিকে শুরু। মিং রাজাদের হাতে পরাজিত সেনাপতিদের কাটা মুণ্ডু সম্রাটের সামনে রাখা হতো। সম্রাট কাটা মুণ্ডুতে লাথি দিতেন। মুণ্ডু গড়িয়ে যেত, সম্রাট আনন্দ পেতেন। তাঁর আনন্দ থেকেই—ফুটবল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইন্ড গেম

তাত্ত্বিক পদার্থবিদেরা (Theoretical physics) ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার চেয়ে মনে মনে অর্থাৎ কল্পনায় পরীক্ষা করতে পছন্দ করেন। এই পরীক্ষাগুলোকে বলে Thought experiment। শ্রোডিনজারের বিড়াল হলো চিন্তাপরীক্ষার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ।

আমরা আমজনতারা চিন্তা পরীক্ষা করতে পারি না। তবে Mind game বা চিন্তা খেলা খেলতে পারি। এই খেলা আমার বিশেষ পছন্দের। খেলার নমুনা দিচ্ছি। একটি আট বছরের বালকের সঙ্গে এই খেলা খেলছি। বালকটির নাম ধরা যাক শুভ্র। আমার এবং তার মধ্যে কথোপকথন—

আমি : শুভ্র! কেমন আছো ?

শুভ্র : ভালো আছি।

আমি : তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো ? মাকে না কি বাবাকে ?

শুভ্র : দুজনকেই সমান সমান (৯৯% শিশুই এই জবাব দেবে)

আমি : ভালো করে চিন্তা করে বলো—সমান সমান ?

শুভ্র : হুঁ।

আমি : আচ্ছা বেশ, এখন কল্পনা করো তুমি তোমার মাকে এবং বাবাকে নিয়ে নৌকায় করে যাচ্ছো [মাইন্ড গেম শুরু হয়ে গেল]

শুভ্র : কল্পনা করছি।

আমি : নৌকায় শুধু তুমি আর তোমার বাবা-মা ? মাঝিও নেই।

শুভ্র : আচ্ছা।

আমি : এই তিনজনের মধ্যে শুধু তুমি সাঁতার জানো। বাকি দুজন সাঁতার জানে না। ok ?

শুভ্র : জি, ok

আমি : তুমি এতই ভালো সাঁতার জানো যে নৌকা ডুবে গেলে বাবা-মা দুজনের একজনকে বাঁচাতে পারবে। বুঝেছ ?

শুভ্র : বুঝেছি।

আমি : এখন মনে করো নৌকা ডুবে গেল। তোমার বাবা-মা দুজনই ডুবে যাচ্ছেন। এখন বলো তুমি কাকে বাঁচাবে ? বাবাকে না মাকে ? [মাইন্ড গেম শুরু হলো]

শুভ্র : দুজনকেই বাঁচাব।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি : তোমাকে আগেই বলা হয়েছে তুমি শুধু একজনকে বাঁচাতে পারবে। বেশির ভাগ শিশু এই পর্যায়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। কারও কারও চোখে পানি এসে যায়।

মনের ওপর চাপ তৈরির এই কঠিন খেলা এখন আমি আর খেলি না।

কারণটা বলি—

এক বালিকা মাইন্ড গেমের এই পর্যায়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমি মাকে বাঁচাব আর আল্লাহ বাবাকে বাঁচাবে।

তখনই ঠিক করেছি, এই নিষ্ঠুর খেলা শিশুদের সঙ্গে খেলব না।

আমার এই মাইন্ড গেমের ফলাফল বলি। ১০০ ভাগ শিশুই বলেছে তারা মাকে বাঁচাবে। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধজন পাওয়া যায়, যারা বাবাকে বাঁচাতে চায়। ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের ছোট মেয়ে (লেখা) তাদের একজন। আমি তাকে বললাম, বাবাকে বাঁচাতে চাও কেন?

সে বলল, বাবা লেখক তো, এইজন্যে বাবাকে বাঁচাব।

তোমার বাবা লেখক না হলে মাকে বাঁচাতে?

অবশ্যই।

মিলন-কন্যার কথাবার্তায় আমি খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। লেখক হওয়ার কারণে আমার শিশুপুত্র হয়তো বা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। বাস্তবে দেখা গেল সেই গুড়ে বালি না, একেবারে কঙ্কর।

পুত্র নিষাদের সব খেলাধুলা আমার সঙ্গে। আমি তার *টম অ্যান্ড জেরি* কার্টুন দেখার সাথি। ছবি আঁকার সাথি। সে যখন ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকে, তখন তার মা তাকে কঠিন শাসন করে। শুধু আমি বলি, ছবি সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে রাক্ষসের ছবিটা তো অসাধারণ!

এতকিছুর পরেও নিষাদের মাথায় তার মা ছাড়া কিছু নেই।

প্লেনে করে দেশের বাইরে যাচ্ছি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বিমান খুব বাম্প করছে। আতঙ্কিত নিষাদ বলল, বাবা, তুমি মাকে বাঁচাও।

আমি বললাম, তোমাকে বা নিনিতকে বাঁচাতে হবে না?

সে বলল, আগে মাকে বাঁচাও।

লস অ্যাঞ্জেলেস, ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে গিয়েছি। ওদের জন্যে একটা রাইড নিয়েছি। এই রাইডে থ্রিডির কিছু কাজ আছে। যাত্রার একপর্যায়ে প্রকাণ্ড এক গরিলার দেখা পাওয়া যাবে। থ্রিডির কল্যাণে গরিলাকে মনে হবে জীবন্ত।

যাত্রা শুরু হলো। একপর্যায়ে সত্যি সত্যি ভয়ংকর এক গরিলার (কিং কং) দেখা পাওয়া গেল। ভালোমতোই জানি, পুরো বিষয়টা থ্রিডি ক্যামেরার কারসাজি। তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরও আমাদের কলিজা শুকিয়ে গেল। নিষাদ ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল—বাবা! আমার মাকে বাঁচাও। বাবা! আমার মাকে বাঁচাও।

পৃথিবীর সব শিশু তাদের মাকে বাঁচাতে চায়। মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত—এই (হাদিস ?) কথা সবসময় বলা হয়ে থাকে। তারপরও মা কী করে শিশুসন্তানকে হত্যা করেন ?

পত্রিকায় পড়লাম, এক মা তাঁর দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে পড়েছেন। এই মহিলা নিজে ঝাঁপ দিতে চাইলে ঝাঁপ দেবেন। অবোধ সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে কেন ?

স্বামীর সঙ্গে রাগ করে স্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এক মা সন্তান হত্যা করলেন। এই মা কেমন মা ?

আমেরিকার এক তরুণী মা তাঁর নয় মাস বয়সী সন্তানকে মাইক্রোওয়েভ চুলায় ঢুকিয়ে চুলা চালু করে হত্যা করলেন। হত্যাকাণ্ডে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। কী ভয়ংকর!

বিড়ালকে নিজের সন্তান হত্যা করে খেয়ে ফেলতে আমি দেখেছি। বাঘও নাকি এ রকম করে।

আমরা কি বিড়াল এবং বাঘের ওপর উঠতে পারি নি ? এখনো পশু হয়ে আছি ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~